## সূচিপত্র


| | বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ২৭। | কে ও কী | (কথাচিত্র) | শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭৭ |
| ২৮। | রাত্রির তপস্যা | (উপন্যাস) | শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র | ৮০ |
| ২৯। | অবরোধ | (নাটক) | বিজন ভট্টাচার্য্য | ৮২ |
| ৩০। | মুহূর্ত্ত | (টুর্গেনিভ থেকে) | মৃণালকান্তি পুরকায়স্থ | ৮[illegible] |
| ৩১। | দৃষ্টিপাত | (উপন্যাস) | (যাযাবর) | ৮৬ |
| ৩২। | **বিজ্ঞান-জগৎ—** | | | |
| | (ক) জগতের উপাদান | (প্রবন্ধ) | শ্রীনিখিলচন্দ্র রায় | ১২ |
| ৩৩। | আন্দাজে | (কবিতা) | পরিমল রায় | ১৩ |
| ৩৪। | প্রেম | " | মণীন্দ্র রায় | ঐ |
| ৩৫। | নাট্যশাস্ত্র | (প্রবন্ধ) | শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী | ১৪ |

## সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| (খ) আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও মেয়েদের কর্ত্তব্য (প্রবন্ধ) | মীরা চট্টোপাধ্যায় | ৪৮ |
| (গ) পদোন্নতি (গল্প) | সুনীতি বসু | ৪৯ |
| (ঘ) সত্যাসত্য | আশাপূর্ণা দেবী | ৫০ |
| ২০। স্বর্গাদপি গরীয়সী (উপন্যাস) | শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৫৭ |
| ২১। হীনমন্যতা (প্রবন্ধ) | চিত্রগুপ্ত | ৬১ |
| ২২। আঁচ (কবিতা) | পরিমল মুখোপাধ্যায় | ৬৩ |
| ২৩। দাম্পত্য জীবন (প্রবন্ধ) | সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬৪ |
| ২৪। দি গুড আর্থ (উপন্যাস) | শিশির সেনগুপ্ত জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী | ৬৭ |
| ২৫। জন্মদিন (কবিতা) | শ্রীমহাদেব রায় | ৭৩ |
| ২৬। রক্তনদীর ধারা (উপন্যাস) | পঞ্চানন ঘোষাল | ৭৪ |

# সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

## শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

করকমলেষু—

বন্ধু,

প্রকাশ্যে আগে বিদ্যার বৃহৎ জাহাজ চালিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, ভীরু কাব্যতরণী চলত তখন আপনার মনে সঙ্গোপনে, কিন্তু প্রকাশ্যে আজ কাব্যের বৃহৎ জাহাজ চালিয়েছেন প্রাণপণে, সঙ্কুচিত বিদ্যার জাহাজ তাই তরণীর রূপধারণ করেছে হয়তো গোপনে গোপনে।

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছাদের উপরে বিস্তৃত কবিত্বপূর্ণ সাহিত্য আসরে বহুগুণীজনের মধ্যে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়—সে আজ কত কালের কথা! সেইদিন থেকেই আমি আপনার অনুরাগী।

আপনার চিত্ত চিরযৌবনের আশীর্ব্বাদে পরমসুন্দর এবং সেইজন্যেই হয়তো ভগবান আপনার মস্তকে পক্ককেশ আবির্ভাবের কোন উপায়ই রাখেন নি! বর্ত্তমানের সাহিত্যিক-মনোবৃত্তিহীন সাহিত্যসেবকদের মধ্যে আপনার সত্যিকার সাহিত্যনিষ্ঠা অতুলনীয় ব'লেই আপনার সখ্য আমার গর্ব্বের নিধি।

আপনি আমার অগ্রজপ্রতিম পুরাতন বন্ধু শরৎচন্দ্রেরও পুরাতন বন্ধু; তাই এই রেখাচিত্রখানি আপনাকেই উপহার দিয়ে ধন্য হলুম;—দেখুন দেখি, আসলের সঙ্গে খানিকটাও মেলে কিনা?

স্নেহানুগত—

হেমেন্দ্রকুমার রায়

## "নাচঘরে"র একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ

"হেমেন্দ্রকুমার যখন তরুণ ও আমি প্রৌঢ়—সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়েই অপরিচিত—তেমন দিনে আরো দু-একটি নবীন সহযোগী নিয়ে প্রতিদিন বসতুম আমরা একটি ছোট ঘরে অধুনালুপ্ত আমাদের 'যমুনা কাগজখানি কেন্দ্র ক'রে নিয়ে। তখন থেকে হেমেন্দ্র আমার বন্ধু। যমুনার সম্পাদক ব'লে হেমেন্দ্রর নাম ছিল না কিন্তু সম্পাদনার যেটি সবচেয়ে কঠিন কাজ, সেই প্রবন্ধের যাচাই বাছাইয়ের ভার ছিল তাহার 'পরে। গল্প, কবিতা, সমালোচনা সব-কিছুর ভালোমন্দ স্থির ক'রে দিতেন তিনিই। সাহিত্য রস-বিচারে সেই অল্প বয়সেই আমরা হেমেন্দ্রর দূরদৃষ্টি ও গভীর অনুভূতির পরিচয় পাই। ললিত-কলার কোনদিকে যে কোনদিন কিছু সৃষ্টি করেনি সে খুঁৎ ধরতে পারে কিন্তু সমালোচনা করতে পারে না। কেবল দৃষ্টির সমগ্রতার অভাবেই নয়, সমবেদনার অভাবেও। সে তো জানেনা কত দুঃখে একটা জিনিষের সৃষ্টি হয়,—তাই ওর ত্রুটি বার করতেই তার আনন্দ ওর সার্থকতার দিকে তার দৃষ্টি যায় না। কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারকে নিজেও করতে হয়েছে সৃষ্টি; তাই তাঁর সমালোচনা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয় হেমেন্দ্রর বিশ্লেষণ উদ্দিষ্ট বস্তুকে পূর্ণতর ক'রে তুলতেই চায় তাকে বিকৃত-তর ক'রে তুলতে চায় না।

"হেমেন্দ্রর রোঁদার ভাস্কর্য্যের আলোচনা আমার মনে আছে। সেই অল্প বয়সেই তিনি যে-জ্ঞান ও রসোপলব্ধির গভীর পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিস্ময়কর। সেখানে হেমেন্দ্র ছিলেন একই সঙ্গে কলাবিদ্ ও কারু-শিল্পের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্র।"

১২শে ভাদ্র ১৩৪০

সামতাবেড়, পাণিত্রাস } শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া

# ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের এই জীবনী লেখা হ'ল আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী ক'রে।

শরৎচন্দ্রের এর চেয়ে বড় জীবনী লেখবার মালমশলা হাতে ছিল, কিন্তু প্রকাশক চেয়েছেন অল্পমূল্যের একখানি ছোট্ট জীবনচরিত প্রকাশ করতে, কাজেই বিস্তৃতভাবে কিছুই বলবার জায়গা হ'লনা। পাঠকরা আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে রেখাচিত্র ব'লেই গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মূর্ত্তিটিই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। তাই মানুষ শরৎচন্দ্রের সাধারণ জীবনের আরো অনেক কথা ও কাহিনী জানা থাকলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেগুলিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

যাঁরা নানা পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে যেখানে যেখানে সাহায্য পেয়েছি যথাস্থানেই উল্লেখ করেছি। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে রইলুম।

এই সুযোগে দুটি কথা ব'লে নি। প্রথম, এই জীবনীর ভিতরে ১৩২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের আটটি রচনার নাম করা হয়েছে। কিন্তু তার উপরেও আর একটি গল্প বেরিয়েছিল, তার নাম "আলো ও ছায়া"। দ্বিতীয়, শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশে প্রথমে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন যথাস্থানে তাঁদের নাম করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভ্রমক্রমে তাঁদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করা হয় নি। তাঁরও নাম উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যাঁদের কথার উপর নির্ভর করেছি, তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য কম নয়। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনাতেও আমার অজ্ঞাতসারেই অল্পস্বল্প ভ্রম থেকে গিয়েছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। ভ্রমগুলি কেউ দেখিয়ে দিলে ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করব। ছবিগুলি দিয়ে উপকার করেছেন "বাতায়ন" সম্পাদক। তাঁকেও ধন্যবাদ। ইতি—

কলিকাতা
২০০/১, অপার চিৎপুর রোড
ফাল্গুন, ১৩৪৪

নিবেদক
হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলাদেশের বালক-বালিকাদের জন্য

শরৎচন্দ্রের শেষ দান

# ছেলেবেলার গল্প

প্রকাশক

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

# সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

## বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র

গাছ হঠাৎ জন্মায় না। জন্মের পরেও গাছের বাড় ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে সারালো জমির উপরে।

শরৎচন্দ্রও হঠাৎ বড় সাহিত্যিক রূপে জন্মগ্রহণ করেন নি। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্যে আগেকার সাহিত্যিকরা জমি তৈরি ও বীজ বপন ক'রে গেছেন। আগে তারই একটু পরিচয় দি।

পৃথিবীর সব দেশেই এক-শ্রেণীর সাহিত্য দেখা দিয়েছে যাকে বলে 'রোমান্টিক' সাহিত্য। বিলাতের স্যর ওয়াল্টার স্কটের, ফরাসী দেশের ভিক্টর হুগো ও আলেকজান্দার ডুমাসের এবং বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ঐ 'রোমান্টিক' সাহিত্যের অন্তর্গত।

ওঁদের উপন্যাসে অসাধারণ ঘটনার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ওঁরা যে-সব চরিত্রের ছবি এঁকেছেন সাধারণত সেগুলি অতিরিক্ত রংচঙে। ওঁরা যে অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা নয়; কিন্তু ওঁরা প্রায়ই রঙিন্ কাঁচের ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলিকে দেখেছেন। তাই চরিত্রগুলির উপরে যে-রং পড়েছে তা তাদের স্বাভাবিক রং নয়।

পৃথিবীতে এখন যে-শ্রেণীর সাহিত্যের বেশী চলন তাকে বলে বাস্তব সাহিত্য। বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ। যদিও বঙ্কিম-যুগে—অর্থাৎ বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ-প্রভাবের সময়ে "রাজর্ষি" ও "বৌঠাকুরাণীর হাট" রচনাকালে তিনিও 'রোমান্টিক' সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন।

বাস্তব সাহিত্যের লেখকরা মানুষকে যেমন দেখেন তেমনি আঁকেন। তাঁরা অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী নন এবং অসাধারণ ঘোরালো ঘটনারও উপরে বেশী ঝোঁক দেন না। রোজ আমরা যে-সংসারকে দেখি, তারই ছোটখাটো সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে সোজা ভাষায় সহজ ভাবে তাঁরা বড় বড় উপন্যাস লিখতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রোমান্টিক' সাহিত্যের পূর্ণ-প্রতিপত্তির দিনেই, আর একজন বাঙালা লেখক বাস্তব সাহিত্য রচনা ক'রে নাম কিনেছিলেন। তাঁর নাম স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর "স্বর্ণলতা" হচ্ছে বাংলা-সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস।

ঘরোয়া সুখ-দুঃখের এমন ছবি আঁকার দরুণ তারকনাথের যশ শরৎচন্দ্রের মতই হঠাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং "স্বর্ণলতা"র সংস্করণের পর সংস্করণ হ'তে থাকে। বঙ্কিম-যুগে আর কোন লেখকের বই এত কাটে নি।

"স্বর্ণলতা"র কাটতি দেখে বহু লেখক তারকনাথের নকল করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের অনুকরণ "স্বর্ণলতা"র মতন সফল হয় নি, কারণ নকলকে কেউ আসলের দাম দেয় না।

তারকনাথ আরো কিছু লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শক্তি বড় ছিল না। বঙ্কিম-যুগে তাঁর প্রতিভা স্ফুলিঙ্গের মতই আমাদের চক্ষে পড়ে।

সেইজন্যেই আমরা বলেছি, বাংলাদেশে বিশেষভাবে বাস্তব সাহিত্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথই। ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তাঁর বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করেছে। বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্র ও দৃষ্টিশক্তি তিনি বিস্তৃত ক'রে তুলেছেন। কেবল নিত্য-দেখা সংসারকেই তিনি তুলে এনে আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখান নি, তার সাহায্যে নব নব ভাব ও আদর্শকে খুঁজেছেন। তারকনাথ এ-সব পারেন নি।

শরৎচন্দ্র যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলাদেশে সত্যিকার বড় আর কোন ঔপন্যাসিককেই দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথও কেবল উপন্যাস নিয়ে কোনদিনই নিযুক্ত থাকেন নি। কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিক নন, একাধারে তিনি মহাকবি, নাট্যকার, গীতিকার, ছোটগল্পলেখক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক এবং প্রত্যেক বিভাগেই নব নব রসের স্রষ্টা। হিসাব করলে দেখা যাবে, তাঁর নানাশ্রেণীর রচনার মধ্যে উপন্যাস খুব বেশী জায়গা জুড়ে নেই।

কাজেই বাস্তব-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরোয়া আলো-ছায়ার ছবি আঁকতে পারেন এবং কথাসাহিত্যের সাধনাই হবে যাঁর জীবনের প্রধান সাধনা, দেশের তখন এমন একজন লোকের দরকার হয়েছিল। দেশের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি একান্ত ভাবেই ঔপন্যাসিক।

শরৎচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কতটা, "ভারতী"তে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সময়েই সেটা জানা গিয়েছিল। গোড়ার দিকে "বড়দিদি" বেরুবার সময়ে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু পাঠকরা লেখা প'ড়ে ধ'রে নেন যে, রবীন্দ্রনাথই নাম লুকিয়ে ঐ উপন্যাস লিখছেন! কেউ কেউ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছিলেন!

শরৎচন্দ্রের কোন কোন গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু দেখলে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে পড়বেই। কিন্তু বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্রসীমা ও দৃষ্টিশক্তি বিস্তৃততর ক'রে তুলেছিলেন, তাই পরবর্ত্তী যুগের লেখক শরৎচন্দ্রও তারকনাথকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন ঢের বেশীদূর।

এখানে আর-একটা কথাও ব'লে রাখা দরকার। শরৎ-সাহিত্যের খানিক অংশ রবীন্দ্রপ্রভাবগ্রস্ত বটে, কোন কোন স্থলে তার বিষয়-বস্তু তারকনাথকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তার অনেকটা অংশই একেবারে আনকোরা। সেখানে শরৎচন্দ্র নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করছেন এবং সেটা হচ্ছে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন দান। এই নূতনত্বের জন্যেই শরৎচন্দ্রের নাম অমর হয়ে রইল।

এইবারে আর-একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলব। 'ষ্টাইল' বা রচনা-ভঙ্গির কথা। যে লেখকের নিজের রচনাভঙ্গি আছে, লেখার তলায় তাঁর নাম না থাকলেও লোকে কেবল লেখা দেখেই তাঁকে চিনে নিতে পারে।

আজ পর্য্যন্ত এমন বড় বা ভালো লেখক জন্মান নি, যাঁর

নিজস্ব রচনাভঙ্গি নেই। ফরাসী দেশে ফ্লবেয়ার নামে একজন লেখক ছিলেন, তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর রচনাভঙ্গির গুণেই।

এক-একজন বড় লেখকের রচনাভঙ্গি আবার এতটা বিশিষ্ট ও শক্তিশালী যে, তা সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ যুগকে প্রকাশ করে। কারণ সেই যুগের অন্যান্য লেখকদেরও উপরে তাঁদের রচনাভঙ্গির প্রভাব দেখা যায় অল্পবিস্তর।

বাংলাদেশে দুইজন প্রধান লেখকের রচনাভঙ্গি সাহিত্যের দুইটি বিশেষ যুগকে চিনিয়ে দেয়। তাঁরা হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আলোচনায় প্রায়ই 'বঙ্কিম-যুগ' ও 'রবীন্দ্র-যুগে'র কথা শোনা যায়, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির প্রাধান্যের জন্যেই ঐ দুই যুগের নামকরণ হয়েছে। বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাভঙ্গির উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কম-বেশী ছাপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধেও ঐ কথা। এখনকার কোন লেখকই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির প্রভাবের ভিতরে না গিয়ে পারেন না। কেউ কেউ পুরোদস্তুর নকলিয়া। সাহিত্যে তাঁদের ঠাঁই নেই।

কোন লেখকই গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ-নিজস্ব রচনাভঙ্গির অধিকারী হ'তে পারেন না, কারণ বহু সাধনার ফলে ধীরে ধীরে নিজস্ব রচনাভঙ্গি গ'ড়ে ওঠে। এমন-কি রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম বয়সের কবিতায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী ব'লে রবীন্দ্রনাথ খুব শীঘ্রই বিহারীলালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

বিহারীলালের সব শিষ্য এটা পারেন নি। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখায় শেষ-পর্য্যন্ত বিহারীলালের রচনাভঙ্গি বিদ্যমান ছিল।

শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গি কি-রকম? তাঁর রচনাভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির মতন অতুলনীয় ছিল না; সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেমন আপন আপন রচনাভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন, শরৎচন্দ্র সে-ভাবে বহু লেখককে আকৃষ্ট ক'রে কোন নূতন যুগ-সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবু তাঁর লেখবার ধরণের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল যা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নিজের জিনিষ।

শরৎচন্দ্রকে দুই যুগপ্রবর্ত্তক বিরাট প্রতিভার আওতায় কলম ধরতে হয়েছিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাভঙ্গির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। পরে বঙ্কিমের প্রভাব ক'মে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেড়ে ওঠে। কিন্তু কি বঙ্কিমচন্দ্র আর কি রবীন্দ্রনাথ, কেহই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ বা সমগ্র ভাবে অভিভূত করতে পারেন নি। যারা রঙের কারখানায় কাজ করে তারা গায়ে মুখে ও জামা-কাপড়ে নানা রঙের প্রলেপ মেখে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাই ব'লে কেউ তাদের চিনতে ভুল করে না—কারণ তাদের আসল চেহারা অবিকৃতই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কারখানায় গিয়ে শরৎচন্দ্র যে প্রথমে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, তাঁর রচনাভঙ্গির ভিতরে কেবল সেই চিহ্নই আছে,—জগতে এমন কোন লেখক নেই, পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদ-লেখকের কাছ থেকে যিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন নি; আসলে শরৎচন্দ্রের সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা-পদ্ধতির ভিতরে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের

প্রভাবই বেশী। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে-কোন রচনা না-জানিয়ে রেখে দেওয়া হোক্; যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে সে শরৎচন্দ্রের রচনাকে বেছে নিতে ভুল করবে না।

শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" "ভারতী" পত্রিকায় বেরিয়েছিল লেখকের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারও কয়েক বৎসর পরে, ১৩১৩ অব্দে।

সে সময়ে মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ছিল "ভারতী," "সাহিত্য," "প্রবাসী," "নব্যভারত" ও "মানসী"। কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথের বাস্তব উপন্যাসগুলির বিপুল প্রভাব। নাট্যসাহিত্যে তখন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী চলেছে; বিশেষ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। কাব্যসাহিত্যে প্রবীণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং নবীনদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। নানা-শ্রেণীর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে লিপিকুশলতা, রচনাভঙ্গি ও চিন্তাশীলতার জন্যে তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের মত শরৎচন্দ্রেরও আবির্ভাব মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ও-ক্ষেত্রে সম্পাদক রূপে তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম খুব বেশী। সুরেশচন্দ্র মিষ্ট ভাষা ও বিশিষ্ট

রচনাভঙ্গির জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থায়ী সাহিত্যের জন্যে তিনি বিশেষ-কিছু রেখে যান নি।

খুব সংক্ষেপেই তখনকার সাহিত্যের অবস্থার ও তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। আমাদের স্থান অল্প, তাই এখানে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা শোভনও হবে না। তবে আমাদের ইঙ্গিতগুলি মনে রাখলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা হয়তো সহজ হবে।

# শৈশব-জীবন ( ১৮৭৬-১৮৮৬ )

হুগলী জেলার একটি গ্রামের নাম হচ্ছে দেবানন্দপুর। যদিও এক সময়ে দেবানন্দপুরের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তবু একালে এ গ্রামটির নাম কিছুকাল আগে খুব কম লোকেরই জানা ছিল। কিন্তু এখন শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে দেবানন্দপুর আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশ, নগর ও গ্রাম বড় হয় মানুষেরই মহিমায়। কোন বিশেষ দেশে জন্মেছে ব'লে কোন মানুষ বড় হ'তে পারে না। অনেকে বড় হবার জন্যে বড় বড় দেশে যান। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ নিজেই বড় হয়ে নিজের দেশকে বড় ক'রে তোলেন।

এই দেবানন্দপুরে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মতিলাল ধনী ছিলেন না, ছিলেন তার উল্টোই ;—অর্থাৎ গরিব। মতিলাল ছিলেন সেকালকার অনেক ব্রাহ্মণেরই মতন নিষ্ঠাবান, কারণ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশী বিস্তৃত হ'তে পারে নি। এখন বিলাতী শিক্ষায় অনেকেই ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্যের কথা ভুলে যান, কিন্তু মতিলাল নাকি এ-দলের লোক ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের কথায় জানতে পারি, মতিলালের আর একটি গুণ ছিল তা হচ্ছে সাহিত্য-প্রীতি।

মতিলালের সহধর্ম্মিণীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী। এঁর কথা ভালো ক'রে এখনো জানা যায় নি, শরৎচন্দ্রের উক্তি থেকেও তাঁর কথা জানা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে-ভাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"তিনি বড় সাদা-মাঠা লোক ছিলেন। কিন্তু এই নিতান্ত সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে একটি স্নেহের সমুদ্র নিহিত ছিল। তিনি কোনদিন কাহারো সহিত সম্বন্ধের দাবির দিক দিয়া ব্যবহার করিতেন না। কর্ত্তারা তাঁহার সেবা-ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা ছিলাম সেই বিশুদ্ধ স্নেহের উপাসক। আজো তাঁর কথা মনে করিতে বুকের মধ্যে চাপ বাধার মত বোধ হয়—চক্ষু সরস হইয়া উঠে!"

১২৮৩ সালের ভাদ্র মাসের ৩১শে (ইংরেজী ১৮৭৬ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) তারিখে মতিলালের প্রথম পুত্রলাভ হয়। এই ছেলেটিই বাংলার আদরের নিধি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গরিব হ'লেও প্রথম পুত্রসন্তান লাভ ক'রে মতিলাল ও ভুবনমোহিনী যে আনন্দের আতিশয্যে খানিকটা ঘটা ক'রে ফেলেছিলেন, এটুকু আমরা অনায়াসেই ধ'রে নিতে পারি। কিন্তু শিশুর ললাটে সেদিন বিধাতা-পুরুষ গোপনে যে অক্ষয় যশের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন, পিতা বা মাতা কেউ সেটা আবিষ্কার করতে পারেন নি। এবং এই শিশু বড় হয়ে যখন পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধন্য করলেন আপন প্রতিভায়, দুর্ভাগ্যক্রমে মতিলাল বা ভুবনমোহিনী সেদিন বিপুল আনন্দে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে সংসার-নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন না!

শরৎচন্দ্রের আরো ছয়টি ভাই জন্মেছিলেন।

মধ্যম ভ্রাতার নাম প্রভাসচন্দ্র। অল্প বয়সেই সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে তিনি নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী প্রভাসচন্দ্রের নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মের দেশে দেশে ছিল তাঁর কার্য্যক্ষেত্র। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, শরৎচন্দ্র তখন পাণিত্রাসে বাস করেছেন। রুগ্ন দেহ নিয়ে বেদানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আবাসে গিয়ে উঠলেন এবং শরৎচন্দ্রেরই কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্র স্বামী বেদানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি সমাধিমন্দির রচনা ক'রে দিয়েছেন এবং পাণিত্রাসে অবস্থান-কালে প্রতিদিন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার স্মৃতির তীর্থে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতেন।

বর্ত্তমান আছেন শরৎচন্দ্রের একমাত্র সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের আগ্রহে বিবাহ ক'রে তিনি গৃহী হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁরও প্রথম জীবনের কিছুকাল কেটেছে ভবঘুরের মত।

এবং শরৎচন্দ্রও প্রথম যৌবনে ছিলেন ভবঘুরের মত। মাঝে মাঝে গৈরিক বস্ত্র প'রে বেড়াতেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মতিলালের বংশে সন্ন্যাসের বীজ গুপ্ত হয়ে ছিল, তাঁর পুত্রদের সংসারের বাঁধন সহ্য হ'ত না। এ-সবের উপরে হয়তো মতিলালের কতকটা প্রভাব ছিল।

শরৎচন্দ্রের দুই বোন্,—শ্রীমতী অনিলা দেবী ও শ্রীমতী মনিয়া দেবী। বড় বোন অনিলা দেবীর নাম নিয়েই শরৎচন্দ্র "যমুনা" পত্রিকায় "নারীর মূল্য" নামে বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই বোনটির কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়ীরই অনতিদূরে পাণিত্রাসে এসে নিজের সাধের পল্লীভবন স্থাপন করেছিলেন। ছোট বোন মণিয়া দেবীর শ্বশুরালয় হচ্ছে আসানসোলে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের নাম স্বর্গীয় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি হালিসহরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ঠাকুরদাস। তাঁরা ভগলপুরে প্রবাসী হয়েছিলেন। ঠাকুরদাস স্বর্গে। শরৎচন্দ্রের একমাত্র নিজের মামা বিপ্রদাস এখন পাটনায় থাকেন।

হালিসহর ও কাঁচড়াপাড়া একই জায়গার দুটি নাম। নৈহাটিও এর পাশেই। একসময় এ-অঞ্চল সাহিত্যচর্চ্চার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাহিত্যসেবকেরই জন্মভূমি হচ্ছে এই অঞ্চলে। শরৎচন্দ্রের মাতামহ-পরিবারেও যে সাহিত্য-চর্চ্চার বীজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ওদিক থেকেও তাঁর কিছু-কিছু সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা আসা অসম্ভব নয়। প্রেরণা যে কোন্ দিক থেকে কখন্ কেমন ক'রে আসে তা বলা বড় শক্ত। সকলের অগোচরে স্ফুলিঙ্গের মত সে মানুষের মনে ঢোকে। তারপর যখন অগ্নিতে পরিণত হয়, সকলের চোখ পড়ে তার উপরে। তবে শরৎচন্দ্রের নিজের বিশ্বাস, তিনি পিতারই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

ঠাকুরমা নাকি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত আদর দিতেন, নাতির হরেক রকম দুষ্টামি দেখেও তাঁর হাসিখুসি একটুও ম্লান হ'ত না। এবং শোনা যায় বালক শরৎচন্দ্রের দুষ্টামির কিছু-কিছু পরিচয়

লিপিবদ্ধ আছে "দেবদাসে"র প্রথমাংশে। নিজের বাল্যজীবনের প্রথমাংশের কথা শরৎচন্দ্র এই ভাবে বলেছেন :—*

"ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন, সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার "বোধোদয়", "পদ্যপাঠে" মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে। আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার আদর আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা। এমনি "বোধোদয়" "পদ্যপাঠে" ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সাঙ্গ হ'ল।" *

এইটুকুর ভিতর থেকেই বালক শরৎচন্দ্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! তিনি সুবোধ বা শান্ত বালক ছিলেন না। লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না। যখন পাঠশালায় যাবার কথা, শরৎচন্দ্র তখন পাড়ার আরো কতকগুলি তাঁরই মতন 'শিষ্ট' ছেলের সঙ্গে দুপুরের রোদে হাটে-বাটে-মাঠে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াতেন, কখনো ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভেসে যেতেন, কখনো খালে-বিলে ছিপ্ ফেলে মাছ ধরতেন, কখনো যাত্রার দলে গিয়ে গলা সাধতেন, আবার কখনো বা নিরুদ্দেশ

* শরৎচন্দ্রের ইংরেজীতে লেখা "আত্মজীবনী"র অনুবাদ একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে "বাতায়নে"র অনুবাদ গৃহীত হ'ল।—লেঃ

হয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়তেন এবং গুরুজনরা দিনের পর দিন তাঁর কোন খোঁজ না পেয়ে ভেবে সারা হতেন! তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যেত, ক্ষতবিক্ষত পায়ে, ধূলো-কাদা-মাখা গায়ে, উস্কখুস্কো চুলে দীন বেশে অপরাধীর মত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে! গুরুজনরা "আদর-আপ্যায়নের পালা" স্থুরু করলেন—অর্থাৎ ধমক, গালাগালি, উপদেশ, ঘুসি চড় কাণমলা —হয়তো বেত্রাঘাতও! তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অনুপস্থিতির জন্যে গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে আর একদফা "আদর আপ্যায়ন" লাভ! অভ্যর্থনার গুরুত্ব দেখে শরৎচন্দ্র ভয়ে ভয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে লক্ষীছেলের মতন "বোধোদয়" খুলে বসতেন! কিন্তু মাথায় যার 'আডভেঞ্চারে'র ঘূর্ণী ঘুরছে, ডানপিটের উদ্দাম স্বাধীনতা একবার যে উপভোগ করেছে, এত সহজে সে-ছেলের বোধোদয় হবার নয়—ঝড়কে কেউ বাক্সবন্দী ক'রে রাখতে পারে না! গায়ের ব্যথা-মরার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন আবার উড়ু-উড়ু করে, তখন কোথায় প'ড়ে থাকে 'পদ্যপাঠে'র শুক্‌নো কালো অক্ষরগুলো, আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় গুরুজনের রক্তচক্ষুর বিভীষিকা! ইস্কুলের ঘণ্টা বাজলে পর দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর জায়গায় হাজির নেই! শরৎচন্দ্রের প্রথম বাল্য-জীবনের এই স্মৃতি থেকেই হয়তো তাঁর অতুলনীয় কথাসাহিত্যের কোন কোন অংশের উৎপত্তি! একটি বালিকাও নাকি দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শৈশবলীলাসঙ্গিনী ছিল এবং তার কাহিনী তিনি পরে কোন কোন বন্ধুর কাছে কিছু-কিছু ব'লেছিলেন। কিন্তু এই হরেঁক-ঋাটির নাম কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। সমবয়সী মেয়েদের এবং শোনা

সঙ্গে পুতুলের সংসার নিয়ে এই অনামী মেয়েটির খেলা করতে ভালো লাগত না, সেও গুরুজনদের শাসন না মেনে যাত্রা করত দুর্দান্ত ছেলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেপরোয়া খেলার জগতে,—যেখানে প্রচণ্ড রৌদ্রে বিপুল প্রান্তর দগ্ধ হয়ে যায়, যেখানে নিবিড় অরণ্যের ভয়ভরা অন্ধকারে দিনের আলো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, যেখানে বর্ষার ধারায় স্ফীত নদীর প্রবাহে শরৎচন্দ্রের নৌকা ঝোড়ো-হাওয়ার পাগলামির আবর্ত্তে প'ড়ে দুলে দুলে ওঠে! মেয়েটির মন ছিল মেঘ-রৌদ্রে বিচিত্র,—মুখ-চোখ ঘুরিয়ে ঝগড়া করতেও জানত, আবার হেসে গায়ে প'ড়ে ভাব করতেও পারত। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও কোন কোন নারী-চরিত্রের মধ্যে নাকি এই মেয়েটির ছবি আঁকা আছে, কিন্তু কোন্ কোন্ চরিত্রে তা কেউ জানে না।

এমনি বারকয়েক পলায়ন ও প্রত্যাগমনের পর মতিলাল ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। ভাগলপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দূর-সম্পর্কীয় মাতুলালয়। এর পরে সেইখানেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে আমরাও দেবানন্দপুরের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছি। দেবানন্দপুরের জল-মাটি শরৎচন্দ্রের দেহকে যে ভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিল, তার ভিতর থেকেই ভবিষ্যতে আত্ম-প্রকাশ করেন বঙ্গসাহিত্যের শরৎচন্দ্র! শিশু-শরৎচন্দ্রের কথা আরো ভালো ক'রে জানা থাকলে তাঁর সাহিত্যজীবনের ভিত্তির কথাও আরো ভালো ক'রে বলতে পারা যেত। কিন্তু শিশু-শরৎচন্দ্রকে সজ্ঞানে দেখেছে এমন কোন লোকও আজ বর্ত্তমান নেই এবং গরিব বামুনের এক দুরন্ত ছেলের ভাবপ্রবণতার কি

থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করবার আগ্রহও কারুর তখন হয় নি। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন।

দেবানন্দপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রকে আবার কিছুকালের জন্যে দেবানন্দপুরে ফিরতে হয়েছিল। তখন ভাগলপুর থেকে তিনি বালকের পক্ষে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের ঝোঁক নিয়ে এসেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ—

"কিন্তু এবারে আর "বোধোদয়" নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ খুলে বার করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা"। আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদিগের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই ক'রে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে, জানিনে। একই স্কুলে বেশীদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টারমশাই একদিন স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি।"

এইখানে প্রকাশ পাচ্ছে, দ্বিতীয়বার দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ফিরেছে সাহিত্যের দিকে। তখন দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছিল না। তাই শরৎচন্দ্রের মত আরো বহু বিখ্যাত সাহিত্যিককেই প্রথম মনের খোরাক যুগিয়েছে ঐ "হরিদাসের গুপ্তকথা" বা ঐ শ্রেণীরই পুস্তকাবলী। আরো দেখা যাচ্ছে, তখন কলম না ধরলেও নিষিদ্ধ পুস্তকের পাঠক বা কথক শরৎচন্দ্র গোয়ালঘরে কতকগুলি শ্রোতা জুটিয়েছেন। তারা কারা? তারা যারা স্কুলে বন্দী হওয়ার চেয়ে শরৎচন্দ্রের 'টো টো এবং শোনা
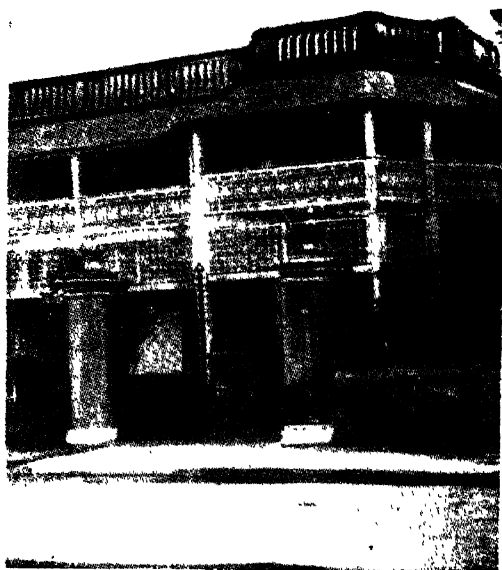
কোম্পানী'তেই ঢুকে হাটে-মাঠে পথে-অপথে বেড়াবার জন্যে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করত! সে-দলের কারুর পাকা মাথার সন্ধান যদি আজ পাওয়া যায়, তা'হলে শরৎচন্দ্রের দুর্লভ বাল্য-জীবনের বহু উপকরণই সংগৃহীত হ'তে পারে। আশা করি, শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর জীবনীর লেখক এ-চেষ্টা করতে ভুলবেন না।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাস্তুভিটা এখন অন্য লোকের হস্তগত। সে ভিটার সঙ্গে তাঁর শৈশব-স্মৃতির অনেক মধুর সুখ-দুঃখ জড়িত আছে ব'লে পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র বাড়ীখানি আবার কেনবার চেষ্টা ক'রেছিলেন ; কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নি।

---

# বাল্যজীবন ও প্রথম যৌবন ( ১৮৮৬-১৮৯৬ )

"এলাম সহরে। একমাত্র "বোধোদয়ে"র নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—"সীতার বনবাস", "চারুপাঠ", "সদ্ভাব-সদ্‌গুরু" ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে আর আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

ভাগলপুরের বাংলা ইস্কুলে ঢুকে শরৎচন্দ্রের মনের ভাব হয়েছিল কি-রকম, তাঁর উপর-উদ্ধৃত উক্তি থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ছাত্রবৃত্তি কেলাসে ভর্ত্তি হয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন, তাঁর সহপাঠীরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে কারুর পিছনে প'ড়ে থাকবেন, এটা বোধ হয় তাঁর ধাতে ছিল অসহনীয়। লেখাপড়ায় তখনি তার ঝোঁক হ'ল। একাগ্র মনে বিদ্যাচর্চ্চা ক'রে অল্পদিনের ভিতরেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের নাগাল ধ'রে ফেললেন।

স্বগ্রাম ছেড়ে এতদূরে দূরসম্পর্কীয় মামার-বাড়ীতে থেকে বিদ্যা-শিক্ষা করার একটা প্রধান কারণও বোধ হয় শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শরৎচন্দ্রের যৌবনের অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আমরা দেখাব যে, শরৎচন্দ্রের ঐ দারিদ্র্যের জন্যে বাংলা সাহিত্যও কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!

ছাত্রবৃত্তি-কেলাসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইস্কুলের যে-ঘড়ী দেখে ছুটি দেওয়া হ'ত, শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা রোজ কাঁধাকাঁধি ক'রে দেওয়ালের উপরে উঠে সেই বড় ঘড়ীটার কাঁটা এত এগিয়ে দিতেন যে, অনেক সময়ে প্রধান শিক্ষক সেই বেঠিক ঘড়ীকে বিশ্বাস ক'রে এক ঘণ্টা আগেই ইস্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হ'তেন। শেষে যেদিন ছেলেরা ধরা পড়ল, সেদিন কিন্তু দোষীদের দলে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যায় নি! তিনি অভিমন্যু-জাতীয় বালক ছিলেন না, বিপদের মুহূর্ত্তে ব্যূহ ভেদ ক'রে স'রে পড়তে পারতেন যথাসময়ে।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের যে বাংলা ইস্কুলে ঢুকে ১৮৮৭ অব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেটি নাকি এখনো বিদ্যমান। এর পর তিনি ওখানকারই তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। ওখানে গিয়ে নাকি তাঁর পড়াশুনায় মতি হয়েছিল, কারণ "আনন্দবাজার পত্রিকা" খবর দিয়েছেন, "তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠেন। মনোযোগী ছাত্র হিসাবে তাহার বেশ সুনাম ছিল।" "ভারতবর্ষে"র সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশ :—

"এন্‌ট্রান্স্ পাশ করিয়া সেই স্কুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে মাত্র ২০৲ টাকা ফী দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন।"

কুড়ি টাকার অভাবে তাঁর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা

আরো অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদও বেরিয়েছে। তিনি নাকি চাকরি ক'রে পিতার অর্থকষ্ট দূর করবার জন্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৮৯৪ অব্দে, সতেরো বৎসর বয়সে। কলেজ ছাড়বার কিছু পরেই (১৮৯৬) তিনি মাতৃহীন হন।

ইস্কুলের কেলাসে শরৎচন্দ্রের পাঠ্যপুস্তকভীতি হয়তো দূর হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তিনি 'গুড বয়' খেতাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু ইস্কুলের বাইরে খেলাধূলার উৎসাহ তাঁর কিছুমাত্র কমে নি এবং এ-বিভাগে তাঁর দক্ষতাও ছিল নাকি যথেষ্ট। দল গ'ড়ে নিজে দলপতি হবার শক্তিও যে তাঁর হয়েছিল, সে পরিচয়ও আছে। তাঁর মাতুল-সম্পর্কীয় বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ—

"শৈশবে আমরা শরৎকে আমাদের খেলার দলের দলপতিরূপে পাইয়াছিলাম। ডাকাতের দলের সর্দ্দারের দোষগুণ বিবৃতিতে সিক্ত হৃদয় যেমন যুগপৎ আনন্দ-বিষাদে মথিত হইয়া ওঠে,—আজও আমাদের দলপতির কথা স্মরণ করিলে অন্তরের মধ্যে তেমনি হর্ষ-ব্যথার সুর বাজিতে থাকে। একদিকে ইস্পাতের মত কঠিন—অন্যদিকে নবনীকোমল। অন্যায়কে পদদলিত করিবার দুর্দ্ধর্ষ সঙ্কল্প, আবার দুর্ব্বলের পরম কারুণিক আশ্রয়দাতা। বালক শরৎ রুদ্রতায় বজ্রের মতই কঠোর ছিল। সময় সময় মনে হইত সে হৃদয়হীন। যাহারা সেই দিকের পরিচয় পাইল তাহারা তাহার শত্রুই রহিয়া গেল; কিন্তু অশেষ স্নেহ ভাজনের দলের ত' অভাব নাই।"

পরের জীবনেও তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোন-দিনই তিনি কোন দলে মিশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান

করাটা পছন্দ করতেন না। এমন-কি যে-দলে তাঁর সমবয়সীর সংখ্যাই বেশী, সেখানেও যৌবন উত্তীর্ণ হবার আগেই শরৎচন্দ্র নিজেকে 'বুড়ো' ব'লে মুরুব্বিআনা করতে ভালোবাসতেন এবং দলপতি হবার কোন কোন গুণও তাঁর ছিল।

ভাগলপুরে গিয়েও অন্যান্য খেলাধূলার সঙ্গে থিয়েটারের আকর্ষণও তিনি এড়াতে পারেন নি। কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি নিজেও নাকি ভালো থিয়েটারি অভিনয় করতে পারতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের "মৃণালিণী"তে তিনি নাকি একটি নারী-ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুনাম কিনেছিলেন। থিয়েটারে সখের অভিনয় করবার জন্যে হয়তো শরৎচন্দ্রের আগ্রহের অভাব ছিল না, হয়তো কোন কোন দলে গিয়ে ছোটখাটো ভূমিকায় তিনি মহলাও দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে রঙ্গমঞ্চে নেমে অভিনয় ক'রে তিনি অতুলনীয় নাম কেনেন-নি নিশ্চয়ই। কারণ ও-বিভাগে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন 'রাজু"। তার কথা পরে বলব।

তাঁর নিজের মুখে আমরা এই গল্পটি শুনেছিঃ "সখের থিয়েটারে ষ্টেজে উঠে যেদিন প্রথম কথা কইবার সুযোগ পেলুম, সেদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি নি। আমার পার্টে কথা ছিল মোটে এক লাইন! আর-একটি ছেলের সঙ্গে আমি ষ্টেজে নামলুম। আগে তারই পার্ট বলবার কথা। কিন্তু সে তো নিজের পার্ট বললেই, তার উপরে আমি মুখ খোলবার আগেই আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট এক লাইন কথাও অম্লানবদনে ব'লে গেল। আমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।"

দুঃসাহসী ডানপিটে ছেলের যে-সব খেলা, ভাগলপুরে গিয়ে

বিদ্যাচর্চ্চার অবকাশে সর্দ্দার শরৎচন্দ্র তাঁর দুরন্ত ছেলের দলটি নিয়ে সেই-সব খেলাতেও যে মেতে উঠতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই খেলার জগতে তিনি এক নূতন সঙ্গী ও বড় বন্ধুও লাভ করলেন। ছেলেটির নাম রাজু বা রাজেন্দ্র এবং সর্দ্দারিতে তার আসন বোধ হয় শরৎচন্দ্রেরও উপরে ছিল। শরৎ ও রাজুর নায়কতায় যে দুষ্টু ছেলের দলটি ভাগলপুরের আকাশ-বাতাস ও গঙ্গাতটকে মুখর ক'রে তুলত, তখনকার বয়োবৃদ্ধদের পক্ষে তারা যে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছিল, এটুকু বুঝতে বেশী কল্পনাশক্তির দরকার হয় না। এই রাজু হচ্ছে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চরিত্র। গুণ্ডামি, ফুটবল-খেলা, ঘুড়ি-উড়ানো, সাঁতার, জিম্‌নাষ্টিক, হাতের লেখা, ছবি-আঁকা, পড়াশুনো, বাঁশী-হারমোনিয়ম বাজানো, গান-গাওয়া ও অভিনয় প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে রাজু ছিল অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী! বাল্যবয়সেই তার সাহস ও তেজের অসাধারণতা ছিল বিস্ময়কর! ভাগলপুরের এক সাহেবের সখের আমোদ ছিল, কালা-আদ্‌মির পৃষ্ঠদেশে চাবুক চাল্‌না! ইস্কুলের জনৈক মাষ্টার বারংবার তাঁর বিলাতী চাবুকের আদরে কাতর হয়ে শেষটা রাজুর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজু তখনি তার দলবল নিয়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের টমটম্‌-শুদ্ধ ঘোড়াকে দড়ীর ফাঁদে বন্দী ক'রে সেই শ্বেতাঙ্গ অবতারকে এমন শিক্ষা দিয়ে এল যে, তারপর থেকে সখের চাবুক-চালনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল! পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র নাকি তাঁর "শ্রীকান্তে"র ইন্দ্রনাথ চরিত্রে বাল্যবন্ধু রাজুকে অমর ক'রে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এ কথা সত্য হ'লে মানতে হয়, রাজুর ভিতরে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাব

ছিল না। এবং সে রাজু আজ কোথায়? ইহলোকে, না পরলোকে? তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়েছে যে, রাজুর মনে তরুণ বয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। গঙ্গার তীরে নির্জ্জন শ্মশানে গিয়ে সে ধ্যানস্থ হ'ত, উপবাস করত, শিশু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইত না এবং স্বচক্ষে "ঈশ্বরের জ্যোতি" দেখে খাতায় তা এঁকে রাখত। তারপর একদিন সে ভাগলপুর থেকে অদৃশ্য হ'ল এবং আজও তার সন্ধান কেউ জানে না। হয়তো রাজু আজ সন্ন্যাসী।

এই সময়েই বোধহয় শরৎচন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারেই ললিত-কলার নানা বিভাগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জড় লোহা নিশ্চয়ই জানে না, চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে যে শিল্পী হবে, তরুণ বয়সে সেও নিশ্চয় শিল্পী ব'লে নিজেকে চিনতে পারে না। তবু তার মনের গড়ন হয় এমনধারা যে, আর্ট তার মনকে টানবেই। এমন-কি আর্টের যে-সব বিভাগ পরে তার নিজের বিভাগ হবে না, সে-সব ক্ষেত্রেও সে প্রাণের সাড়া পায়; কারণ সব আর্টেরই মূলরস হচ্ছে এক।

যাত্রা-থিয়েটারের দিকে শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, কারণ ওটা হচ্ছে আর্টেরই আসর। তিনি নিজে বিখ্যাত অভিনেতা না হ'লেও পরে বাংলাদেশের নাট্যকলা তাঁরই কথাসাহিত্যকে বিশেষ-ভাবে অবলম্বন ক'রে অল্প পুষ্টি লাভ করে নি। এবং সে-হিসাবে তাঁকে অনায়াসেই নাট্যজগতের একজন ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। তারপর ভাগলপুরেই হয়তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতকলার প্রতি অনুরাগ হয়। তিনি নিয়মিত ভাবে কণ্ঠসাধনা করেছিলেন ব'লে প্রকাশ নেই;

কিন্তু আমরা স্বকর্ণে শুনে জেনেছি যে, শরৎচন্দ্র ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন: তিনি নিজের চেষ্টায় শুনে এমন গান শিখেছিলেন এবং সে গান এমন কৌশলে গাইতে পারতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনত। যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর হাত ছিল, ব'লেই শুনেছি। এবং কিছু কিছু ছবি আঁকতেও পারতেন। (পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রেরও মিল ছিল কতখানি!) সাহিত্যক্ষেত্রে না এলে শরৎচন্দ্র পরে হয়তো শ্রেষ্ঠ গায়ক, বাদক বা চিত্রকর রূপে আত্মপ্রকাশ করতেন; কারণ যথার্থ কলাবিদের স্বভাব নয় চিরদিন আত্মগোপন ক'রে থাকা: আর্টের কোন-না-কোন পথ বেছে নিয়ে একদিন-না-একদিন তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়বেনই। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের মত লুকিয়ে রাখবার জিনিষ নয় আর্ট।

এবং ইতিমধ্যে অতি গোপনে চলছিল সাহিত্য চর্চ্চা। মাতুলালয়ে থেকে শরৎচন্দ্র কেবল নিজেই লেখাপড়া করতেন না, বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের পড়ানোরও ভার ছিল তাঁর উপরে। এ-সবের পালা চুকিয়ে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলত তাঁর সাহিত্যের অনুশীলন।

শরৎচন্দ্র পরে একাধিক বন্ধুর কাছে বলেছেন: "আমি অনেক দলে গিয়ে মিশেছি, অনেক ভালো-মন্দ সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে, কিন্তু কোথাও আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি নি। সর্ব্বদাই আমার মনে হ'য়েছে, আমি ওদের কেউ নই।"......এই যে মনে-মনে নিজেকে আলাদা ক'রে রাখা, এটা হচ্ছে বড় কলাবিদের লক্ষণ। দেবানন্দপুরের গরিবের ঘরের দামাল

ছেলে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এসে উচ্চতর কর্ত্তব্যসাধনের জন্যে নিজেকে যদি আলাদা ক'রে না রাখতে পারতেন, তাহ'লে তাঁকেও আজ যবনিকার অন্তরালে বাস করতে হ'ত। যে নদী সমুদ্রের ডাক শুনেছে, মাঝপথে নিজের শাখা-প্রশাখাকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত জলধারা সে নিঃশেষিত ক'রে ফেলে না, তাঁর প্রধান গতি হবে সমুদ্রের দিকেই। লোকে যাকে কবিতা বলে শরৎচন্দ্র তেমন কবিতা কখনো লেখেন নি বটে, কিন্তু তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য্যের অভাব নেই কিছুমাত্র। অতি-তরুণ বয়সেই —ভাগলপুরে থাকতেই—তাঁর চিত্ত যে কাব্যরসে স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন বর্ণন করতে গিয়ে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন :

"ঘোষেদের পোড়োবাড়ীর একধারে উত্তর দিকে গঙ্গার উপরেই একটা ঘরের পিছনে কয়েকটা নিম আর দাঁতরাঙ্গা গাছে একটুখানি ছোট জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল। নিমের গোলঞ্চ মদনের কাঁটা-লতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে বেড়িয়া থাকিত যে, তাহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে এ বিশ্বাস বড় কেহ করিতে পারিত না। এক একদিন দলপতি কোথাও উধাও হইয়া যাইত ; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "তপোবনে ছিলাম।"

হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বোধ করি। আমাকে "তপোবন" দেখানো হইবে জানিতে পারিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গুরু গুরু করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে শরৎ বলিল, "তুই যদি আর কাউকে ব'লে দিস ?" পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "কাউকে বল্‌বো না।" কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না, বলিল, "উত্তরদিকে ফের্, ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষ্য ক'রে বল্।" তাহাও করিলাম। তখন সে আমাকে

সঙ্গে করিয়া অতি সন্তর্পণে লতার পর্দ্দা সরাইয়া একটি সুপরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেল। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়া সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করার জন্য একটা স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোয় সেই জায়গা চক্ষু ও মনকে নিমেষে শান্ত করিয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠিয়া বসিয়া সে স্নেহভরে ডাক্ দিল—"আয়।" তাহার পাশে বসিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম—খরস্রোতে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে—গঙ্গার ও-পারে—নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। শীতল বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছিল। সে বলিল, "এইখানে ব'সে ব'সে আমি সব বড় বড় কথা ভাবি।" উত্তরে বলিলাম,—"তাইতে বুঝি তুমি অঙ্কতে এক্শোর মধ্যে এক্শোই পাও?" সে অবজ্ঞাভরে বলিল,—"দূং!"

ফিরিবার সময় সে বলিল, "কোনোদিন এখানে একলা আসিস্ নে—"

"কেন?"—

"ভয় আছে।"—

"ভূত?"—

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভূত-টূত কিছু নেই।"

"তবে?"—

"এখেনে সাপ থাকে।"

এর আগেই আমরা দেখিয়েছি, ইতিমধ্যে একবার দেবানন্দপুরে গিয়ে শরৎচন্দ্র ইস্কুলের বই ফেলে লুকিয়ে "হরিদাসের গুপ্তকথা" ও "ভবানীপাঠক" (ওদের লেখক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় একসময়ে বাঙালী পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং তাঁর একটি নিজস্ব 'ষ্টাইল'ও ছিল) প্রভৃতি পড়তে সুরু ক'রে সাহিত্যচর্চ্চার একটি পিচ্ছল সোপানের উপরে উঠেছেন। তারপরের কথাও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনুন:

"এইবার খবর পেলুম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না! প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা যে না করেছি তা নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।"

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মহিমায় শরৎচন্দ্রের নিজেরও লেখনীধারণের লোভ হয়েছে! এইভাবে তরুণ বয়সে বঙ্কিমের কত পাঠক যে লেখকে পরিণত হয়েছে, তার খবর কেউ রাখে না! বঙ্কিমের লেখায় যে-যাদু আছে, শরৎচন্দ্র যে তার দ্বারা কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন সেটাও লক্ষ্য করবার ও স্মরণ রাখবার বিষয়। শেষ-জীবন পর্য্যন্ত বঙ্কিমের প্রভাব যে তিনি ভুলতে পারেন নি, সে ইঙ্গিতও আছে। অতঃপর শুনুন:

"তারপরে এল 'বঙ্গদর্শনে'র নব-পর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির যেন একটা নূতন আলো এসে চোখে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোনো কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে পায়, এর পূর্ব্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিন শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?"

শরৎচন্দ্র ভাষা ও রচনাপদ্ধতির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের

কাছে ঋণী বটে, কিন্তু নিজের লেখনীধারণের গুপ্তকথা এই ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন :

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হ'তে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারতেন না। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'রে যান নি এই ব'লে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হ'তে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি লিখতে সুরু করি।"

যদি শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উপরে নির্ভর করি তাহ'লে বলতে হয়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে, পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলি শেষ করবার আগ্রহে সর্ব্বপ্রথমে তিনি কলম ধরেন এবং সম্ভবত তখন তিনি ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, কারণ শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ব'লে প্রকাশ। শরৎচন্দ্র প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম লেখনীধারণ ও আত্ম-

প্রকাশের মাঝখানে কেটে গিয়েছে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত জেগে একেবারে সাহিত্য-গগনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিলেন, তাঁরা ভ্রান্ত। দীর্ঘকাল ধ'রে প্রস্তুত না হ'লে ও সাধনা না করলে সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না। শরৎচন্দ্র সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করেন নি, অধিকাংশ সাহিত্যিকের—এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য হ'চ্ছে এইখানে। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে শরৎচন্দ্র কখনো ভেবেছেন, কখনো কলম ধ'রেছেন এবং কখনো কলম ছেড়ে প'ড়েছেন—অর্থাৎ সাহিত্যের ও আর্টের অনুশীলন করেছেন এবং সেটাও চরম আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! হেটো আর বোকা লোকেই বলবে, শরৎচন্দ্র কলম ধ'রেই সাহিত্য-রাজ্য জয় ক'রে ফেললেন। আসলে যা বাইরের নয়, যা অন্তরের সত্য, শরৎচন্দ্র নিজেই তা এইভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

"এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'লো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে, —ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য দ্রুত-বেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল, কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য।

এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বইই বারবার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথায়ও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কি না—এ সব বড় কথা কখনও চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।"

এইটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্র কেবল নিজের অপরিশোধ্য ঋণস্বীকারই করেন নি, প্রকাশ করেছেন যে, দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও এবং লেখনী ত্যাগ ক'রেও 'পূর্ণতর সৃষ্টি'র জন্যে মনে মনে তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন। ১৩১৯ সালে কেউ কেউ দৈবগতিকে তাঁর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা না থাকলেও শরৎচন্দ্র আর বেশীদিন আত্ম-গোপন করতে পারতেন না। বড় নদীর স্রোতকে কেউ চারিদিকে পাথরের পাঁচিল তুলে একেবারে রুদ্ধ করতে পারে না। যত উঁচু পাঁচিলই তোলো, দুদিন পরে নদী বাধা ছাপিয়ে উপচে পড়বেই।

রবীন্দ্র-প্রতিভাকেই আদর্শরূপে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র স্বদেশে ও প্রবাসে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। এ আদর্শ তাঁর সুমুখ থেকে কখনো স'রে গিয়েছিল ব'লে মনে হয় না, শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সেও তাঁর রচনার ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টির উপরে রবি-করের লীলা দেখা যায়। যখন বাংলার জনসাধারণের মাঝখানে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যখন তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বাইরের

আলোকে এসেছে, তখনও ( ১৭—১১—১৯১৫ ) একখানি পত্রে তিনি তাঁর কোন বন্ধুকে লিখছিলেন :

"আমি আবার একটা গল্প ( উপন্যাস ? ) লিখছি।.........এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবু'র ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ' তবে ধরবার জো নেই।"

সুতরাং এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সমগ্র ভাবে না হোক, আংশিক ভাবেও শরৎ-সাহিত্যের উৎস খুঁজলে রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই দেখা যাবে।

শরৎচন্দ্র যৌবনের প্রথমেই লেখকের আসনে এসে বসলেন। সেই সময়ে বা তার কিছু আগে-পরে শরৎচন্দ্র নিজের চারিপাশে কয়েকটি তরুণকে নিয়ে একটি লেখক-গোষ্ঠী গঠন ক'রে নিয়েছিলেন এবং তাদের দলপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকেই। তাঁদের অধিকাংশই এখন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন, যেমন—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। ( যদিও সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথকে ভাগলপুরের "সাহিত্য-সভা"র নিয়মিত সভ্য না ব'লে "ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি"র সভ্য বলাই উচিত। সৌরীন ছিলেন কলকাতার ছেলে। )

তখনকার দিনের ঐ তরুণের দল নিয়মিত ভাবে যে-আসরে এসে সমবেত হ'তেন তার নাম ছিল নাকি "সাহিত্য সভা"। যাঁরা প্রথম সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের ব্রত ক'রে তুলতে চান, তাঁদের পক্ষে এ রকম আসরের দরকার হয় সত্য-সত্যই। এ-সব

আসরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ফলে পাওয়া যায় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে নব নব প্রেরণা। উক্ত সভার মুখপত্রের মতন ছিল একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্র, নাম "ছায়া"। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আর-একখানি পত্রিকার নাম করেছেন—"তরণী"। কিন্তু এই "তরণী" আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার ভবানীপুরে। এবং তার নিয়মিত লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন (সেন-ব্রাদার্স), ও শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। "ছায়া" ও "তরণী" ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ডাকযোগে তারা কলকাতা থেকে ভাগলপুরে কিংবা ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আনাগোনা করত এবং "ছায়া" করত "তরণী"র লেখার উত্তপ্ত ও সুতিক্ত সমালোচনা এবং "তরণী"তে "ছায়া"র লেখা সম্বন্ধে যে-সব মতামত থাকত তারও তীব্রতা কম ধারালো ছিল ব'লে মনে করবার কারণ নেই। 'ছায়া"র সযত্নে বাঁধানো খাতা পরে "যমুনা"র খোরাক জোগাবার জন্যে নিঃশেষে আত্মদান করেছিল। প্রতিযোগী "তরণী" এখন আর কল্পনা-সায়রে ভাসে না বটে, কিন্তু তার কিছু-কিছু নমুনা নাকি আজও পাওয়া যায়!

হাতে-লেখা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাগান' নামে অন্য খাতায় অন্যান্য রচনাও তোলা ছিল। কি কি রচনা, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি, নানা জনে নানা লেখার নাম উল্লেখ করেছেন, হয়তো নামের তালিকা নির্ভুল নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এতগুলি লেখার নাম পেয়েছি: "কাক-বাসা", "অভিমান",
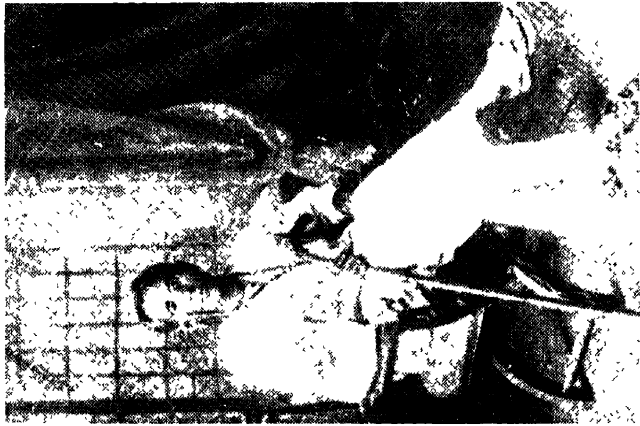
"পথের দাবী" রচনাকালে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র (কৈশোরে

("ইষ্টলিনে"র ছায়ানুসরণ), "পাষাণ", (Mighty Atom-এর অনুসরণ) "বোঝা", "কাশীনাথ", "অনুপমার প্রেম", "কোরেল", "বড়দিদি", "চন্দ্রনাথ", "দেবদাস", "শুভদা", "বালা", "শিশু", "সুকুমারের বাল্যকথা", "ছায়ার প্রেম", "ব্রহ্মদৈত্য", ও "বামুন ঠাকুর" প্রভৃতি। হয়তো এদের কোন-কোনটি ঐ হাতে-লেখা কাগজের সম্পত্তি নয়, স্বাধীন উপন্যাস বা গল্পের আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন-কোনটি হয়তো শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ত্যাগের পর লিখিত। দেখছি, শরৎচন্দ্রের তখনকার রচনার মধ্যে একাধিক অনুবাদও ছিল। কিন্তু পরের বয়সে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। কারণ তাঁকে বলতে শোনা গেছে—"অনুবাদ করা আর পণ্ডশ্রম করা একই কথা। ও আমার ভালো লাগে না।" শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলির কয়েকটি পরে "যমুনা" ও "সাহিত্য" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোন-কোনটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, শরৎচন্দ্র তখন নাকি এই নাম ব্যবহার করতেন—St. C. Lara অর্থাৎ St = শরৎ; C—চন্দ্র; এবং Lara অর্থে শরৎচন্দ্রের ডাকনাম "ন্যাড়া"!—অপূর্ব্ব ছদ্মনাম!

"কাকবাসা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:—

"উপন্যাস লেখার এই বোধ করি আদি চেষ্টা। এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু সে সময় এখানি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—

সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে!·········লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল।"

সুরেনবাবুর শেষ কথাগুলি পড়লে অধিকাংশ সাধারণ নূতন লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণত নিম্ন-শ্রেণীর লেখকরা নিজেদের লেখার সম্বন্ধে হন অন্ধ, তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যা লেখেন সবই অমূল্য রত্ন, সমজদার সুখ্যাতি না করলে তাঁদের দ্বিতীয় রিপু হয় প্রবল! কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই নিজের রচনার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন, যা লিখতেন তাইই তাঁর মনের মত হ'ত না এবং পছন্দ না হ'লে নির্ম্মম ভাবে তাকে ত্যাগ করতেও পারতেন! এটা হচ্ছে প্রতিভাধরের লক্ষণ, তাঁর বিচারনিপুণ মন নিজের কাজেও তৃপ্ত নয়!

আজকালকার নূতন লেখকদেরও দেখি, প্রথম লিখতে শিখেই মাসিক সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা মহাব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সব আর্টের মতন সাহিত্যের আসরেও যে শিক্ষাকাল আছে, এটা হয়তো তাঁরা বিশ্বাস করতে রাজি নন। গত-যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই কোন সৎগুরুর শিষ্যত্বগ্রহণ বা কোন বড় আদর্শকে সামনে রেখে হাতমক্স করতেন, কাগজে কালির আঁচড় কাটতে শিখেই মাসিকপত্রের আফিসের দিকে ছুটতেন না। শরৎচন্দ্রও এই নীতি মেনে চলতেন। তাই তাঁর প্রথম জীবনের প্রত্যেক রচনার দৌড় ছিল হাতে-লেখা পত্রিকার আসর পর্য্যন্ত। সে-সময় তিনি যে বাতিল হবার মতন লেখা লিখতেন না তার প্রমাণ তাঁর তখনকার

অনেক লেখাই বহুকাল পরে প্রকাশ্য সাহিত্যের দরবারে এসে অসাধারণ সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখেই যে পরে তাঁর প্রথম বয়সের রচনা "সাহিত্যে"র মত বিখ্যাত পত্র প্রকাশ করতে রাজি হয়েছিল, তা নয়; তার মধ্যে বাস্তবিকই বস্তু ছিল। এরও প্রমাণ আছে। "ভারতী"ও ছিল একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। "ভারতী" যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে যেচে "বড়দিদি"কে গ্রহণ করেছিল, তখন শরৎচন্দ্র নামক সাহিত্যিকের অস্তিত্বও জনসাধারণের জানা ছিল না এবং প্রথমে শরৎচন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত "ভারতী"তে প্রকাশ করা হয় নি! তবু সাধারণ পাঠকদের উপভোগের পক্ষে "বড়দিদি"ই হয়েছিল আশাতীত রূপে যথেষ্ট!

কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজের বিচারে "বড়দিদি" প্রভৃতি তাঁর আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে নি, তাই তখনকার মত তারা হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যেই বন্দী হয়ে রইল, বন্ধুরা বহু অনুরোধ ক'রেও তাদের কোনটিকে প্রকাশ্য সাহিত্য ক্ষেত্রে হাজির করবার অনুমতি পেলেন না! এবং আত্মরচনা বিচার করতে ব'সে শরৎচন্দ্রের ভুল হয়েছিল ব'লেও মনে করি না। কারণ তাঁর আত্মপ্রকাশের যুগের রচনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, প্রকাশভঙ্গি, রচনারীতি ও চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী গল্প বা উপন্যাসগুলি সত্য সত্যই অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর! এথেকেই প্রমাণিত হয়, জনসাধারণের বিচার আর শিল্পীর বিচার এক নয়!

আসল কথা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের ভিতরে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য তখন পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; সে আর অল্পে তুষ্ট হ'তে পারছে না। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছেন, তাঁর প্রাথমিক শক্তি যাকে প্রকাশ করতে অক্ষম! তাঁর সাহিত্য-সাধনার ধারা তখন যদি অব্যাহত থাকতে পারত, তাহ'লে অনতিকাল পরেই হয়তো বাংলাদেশে আমরা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য আবির্ভাব দেখবার সুযোগলাভ করতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে দারিদ্র্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যের জন্যেই তাঁকে ভাগলপুর পরিত্যাগ করতে হ'ল। তারও পরে কিছুকাল তিনি লেখনীকে একেবারে তুলে রাখেন নি বটে, কিন্তু নানাস্থানী হয়ে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চ্চার সুবিধা আর বোধহয় হ'ত না। দারিদ্র্য বহু শিল্পীর সর্ব্বনাশ করেছে এবং শরৎচন্দ্রের দান থেকেও দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে। নইলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আকার আরো কত বড় হ'ত কে তা বলতে পারে?

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে মানুষ-শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আর-একদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। দেখি, ছেলেবেলা থেকেই তিনি কোন-একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বেশীদিন থাকতে পারেন না। এমন কি যে-বয়সে মায়ের কোলই ছেলেদের সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, তখনও তিনি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন! শোনা যায়, তিনি নাকি একবার পায়ে হেঁটে পুরীতেও গিয়েছিলেন! রেঙ্গুনে পালাবার আগে তিনি যে কতবার কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন,

কারুর কাছে তার সঠিক হিসাব আছে ব'লে জানা নেই। এমন-কি মাঝে মাঝে তিনি দস্তুরমত সন্ন্যাসী সেজেও ডুব মেরেছেন! রেঙ্গুন থেকে ফি'রে এ'সেও তিনি তাঁর সাহিত্যিক যশের লীলা-ক্ষেত্র কলকাতায় দীর্ঘকাল ধ'রে বাস করতে পারেন নি। কখনো থেকেছেন পাণিত্রাসে, কখনো থেকেছেন বেনারসে, কখনো ছুটেছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে, শেষ-জীবনে কালাপানি লঙ্ঘন করবারও চেষ্টায় ছিলেন,—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর ঘর-পালানো মন তাঁকে 'অচলায়তনে'র মধ্যে বাঁধা পড়তে দেয় নি। এটা ঠিক প্রতিভার অস্থিরতা নয়, কারণ পৃথিবীর অনেক প্রতিভাই স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে রাজি হয় নি। যদিও বাংলাদেশের আর এক বিরাট প্রতিভার মধ্যে বিচিত্র অস্থিরতা দেখা যায় এবং তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

# মধ্যকাল ( ১৮৯৭—১৯১৩ )

আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকেই অল্পের মধ্যে যতটা-সম্ভব ভালো ক'রে দেখাতে চাই। কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন-নাট্যের যে-অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে দারিদ্রের বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, পিতৃশোক ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যে কাতর এমন একটি মানুষকেই বেশী ক'রে দেখতে পাই, যাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা ছাইচাপা আগুনের মত প্রায়-নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। এর প্রথম দিকটায় মাঝে মাঝে অনুকূল হাওয়ায় ছাই উড়ে আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র কলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলে দেন নি বটে, কিন্তু তারপরেই তাঁর লেখা-টেখা বহুকালের জন্যে ধামাচাপা পড়ে। এই সময়টায়—তাঁর নিজেরই কথায়—শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনকালে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের আর কোন সাহিত্যিক এমন দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ভুলে থেকে আবার সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে পরিপূর্ণ মহিমায় সকলকে অবাক ক'রে দিতে পারেন নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর তুলনা দুর্লভ। এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁরা প্রথম জীবনে অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ও জনতার অভিনন্দন পেয়ে আচম্বিতে সাহিত্যধর্ম্ম

ত্যাগ ক'রে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন, আর দেখা দেন নি। যেমন ফরাসী কবি Arthur Rimband; তাঁর সতেরো বছর বয়সের সময়ে সারা ফ্রান্স তাঁকে অতুলনীয় প্রতিভাবান ব'লে অভ্যর্থনা করেছিল, কিন্তু সাহিত্য-সমাজের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি স'রে পড়লেন; চ'লে গেলেন একেবারে আবিসিনিয়ায়; এবং বাকি জীবন ব্যবসায়ে মেতে আর কবিত্বের স্বপ্ন দেখেন নি।

কিন্তু আমরা একজন কবিকে জানি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। তিনিও জাতে ফরাসী, নাম Paul Valery। বিশ বৎসর বয়সে তিনি কবিযশোপ্রার্থী হয়ে পারি সহরে এলেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব দেখে জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক তাঁকে খুব আদর করতে লাগলেন। কিন্তু Valery কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলেন যে, শরীরী মানুষের পক্ষে কবিত্বের চেয়ে অভাবের তাড়না ও পেটের দায় হচ্ছে বড় জিনিষ। তিনি ছিলেন Stephane Mallarme-র মতন মতন সেই শ্রেণীর কবি, কবিতা প'ড়ে লোকে সহজে বুঝতে পেরে সুখ্যাতি করলে যাঁরা খুসি হ'তেন না! সুতরাং তেমন কবিতা লিখে অন্নসংগ্রহের উপায় নেই দেখে Valery হঠাৎ একদিন ডুব মারলেন।...... বছরের পর বছর যায়, Valerya কোন পাত্তা নেই। যে-দুচার-জন কবিবন্ধু তাঁকে ভোলেন নি তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, কবি নিরুদ্দেশ হ'লেন কোথায়? অদৃশ্য না হ'লে এতদিনে না-জানি তাঁর কত যশই হ'ত! কিন্তু কেউ খবর পেলে না যে, Valery তখন কোন ব্যবসায়ীর সেক্রেটারি-রূপে অজ্ঞাতবাস

করছেন এবং অবসরকালে করছেন কাব্যের বদলে গণিতবিজ্ঞানের চর্চ্চা!

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেল! তারপর আচম্বিতে একদিন ফরাসী সাহিত্যক্ষেত্রে কবি Valeryর পুনরাবির্ভাব! এখন তিনি আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে একজন অমর কবি রূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ! তাঁর এক টুক্‌রো কবিতার নমুনা হচ্ছে এই:

"The Universe is a blemish
In the purity of Non-being."

শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অতটা না মিললেও, ফরাসী গল্প ও উপন্যাস লেখক গী দে মোপাসাঁর কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ফ্লবেয়ারের অধীনে অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপ্রকাশ্যে শিক্ষানবিসি ক'রে মোপাসাঁ একটিমাত্র গল্প নিয়ে প্রথম যেদিন আত্মপ্রকাশ করলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন সেই দিনই। তারপর মাত্র দশ-বারো বৎসর লেখনী চালনা ক'রেই মোপাসাঁ নিজের বিভাগে বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন!

সাধারণত যে-সব উদীয়মান সুলেখক হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে কার্য্যান্তরে মন দেন, দীর্ঘকাল পরে কলম ধরলেও অনভ্যাসের দরুণ আর তাঁরা ভালো লিখতে পারেন না। সেই জন্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে এ সব লেখকের পুনরাগমন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর একজন লেখককে আমরা বহুকাল পরে উৎসাহিত ক'রে কলম ধরিয়েছিলুম। যে-বৎসরে "যমুনা" পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই এবং ঐ কাগজেই আমরা প্রকাশ করেছিলুম তাঁর একাধিক রচনা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

তাঁর পুনরাগমন সফল হ'ল না। অথচ পুরাতন "ভারতী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তখন সকলেই জানত, তিনি একজন খুব বড় লেখক হবেন। আমরা তাঁর নাম করলুম না, কারণ তিনি হয়তো এখনো ইহলোকেই বিদ্যমান।

কিন্তু আগেই দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্র ঐ-শ্রেণীর লেখকদের দলে গণ্য হ'তে পারেন না। সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত ও জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি লেখনীত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাশীল মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে নি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের—রচনা বরাবরই তাঁর বুভুক্ষু মস্তিষ্কের খোরাক যুগিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলমই ছেড়েছিলেন, সাহিত্যকে ছাড়েন নি। মন ছিল তাঁর সক্রীয়; এবং মনই করে সাহিত্য সৃষ্টি।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য হ'লেন, তাঁর তখনকার কার্য্যকলাপ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। বেশী কথা বলবার মালমশলাও আমাদের হাতে নেই।

নানাকারণে তাঁদের আত্মসম্মানে বারংবার আঘাত লাগায় পিতার সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র খঙ্গরপুর, তারপর অন্যান্য জায়গায় যান—চাকরির সন্ধানে। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় নালিস ছিল, তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী! বই পড়তে ভালোবাসেন, লেখার অভ্যাস আছে, নক্সা আঁকেন, ফুলের মালা গাঁথেন, অথচ টাকা রোজগার

করতে পারেন না! শ্বশুরবাড়ীতে তাই গরিব ও বেকার জামাইয়ের আর ঠাঁই হ'ল না এবং সংসারে এইটেই স্বাভাবিক। ভাগলপুরের আত্মীয়-আলয়ে মতিলাল ও শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতনের কাহিনী আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ ক'রে কাজ নেই। তার পরের কথা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ভাষাতেই শুনুন। তখন হাতে-লেখা খাতায় বা মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা প'ড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ঃ

"হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, সেই অপ্রকাশিত লেখার লেখক মজঃফরপুরে আমাদের বাসায় অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে। আমার স্বামী আমার মুখেই ইতিপূর্ব্বে শরৎবাবুর লেখার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তাই নাম জানিতেন। মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, "একটি বাঙ্গালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্ম্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু লোকটি বাঙ্গালীই, একদিন গান শুনবে? নিয়ে আসবো তাকে?"

বাড়ীতে সন্ধ্যা বেলা এক একদিন গান বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ীতে অতিথিরূপে এখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতই ছিল। সে সময় তিনি কিছু নূতন রচনা না করিলেও তাঁহার যে স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অপেক্ষা করিয়াছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয় করিয়া রাখিত। শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথা-

বার্ত্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখনকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত লোকও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্য্যা, মৃতের সংকার এমনই সব কঠিন কার্য্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎ বাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখর বাবুর বাড়ী থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই 'শ্রীকান্তের' কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখরনাথ বাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাঁহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট প্রমুখাৎ শুনি তিনি বর্ম্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাঁহার মৃত্যু সংবাদও রটিয়াছিল।"

সাধারণ মানুষ শরৎচন্দ্রের তখনকার যে ছবিটি কল্পনায় আসছে, তা হ'চ্ছে এইরকম। একটি বোগাসোগা কালো যুবক, চোখে শ্রান্ত স্বপ্নবিলাসের ছাপ আছে, চেহারায় ও কাপড়-চোপড়ে পারিপাট্য নেই, লাজুক অথচ মিষ্টভাষী, মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, খোসগল্পেও সুপটু, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে হন বজ্রের মতন কঠিন, আত্ম-পরিচয় দিতে নারাজ, সর্ব্বাঙ্গে ফোটে আলাভোলা বৈরাগ্যের ভাব, পরদুঃখে কাতর, পর-সেবায় তৎপর, সুকণ্ঠ, বাঁশী ও তবলায় দক্ষ! এমন একজন মানুষ যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন, এটা আশ্চর্য্য কথা নয়। কিন্তু এঁকে অপমান করতে গেলে সাহসীকেও আগে ভাবতে হয়!

মহাদেব সাহুর কাছে কাজ করবার সময়ে শরৎচন্দ্রের শিকারেরও সখ হয়। অবসরকালে প্রায়ই তিনি বন্দুক হাতে ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের মনের কোথায় খানিকটা যে ক্ষাত্রবীর্য্য ছিল, সেটা পরেও লক্ষ্য করা গেছে। যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, সেই পরিণত বয়সেও পকেটে তিনি ধারালো বড় ছোরা রেখে পথে বেরিয়েছেন। একথা সত্য কিনা জানি না, তবে কেউ কেউ লিখেছেন শরৎচন্দ্র নাকি সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি ক'রেই রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনী আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনি নি। তবে সশস্ত্র থাকবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল বরাবরই। বৃদ্ধবয়সেও—ছোরা ত্যাগ করলেও—এমন এক ভীষণ মোটা লগুড় হাতে নিয়ে নিরীহ বন্ধুদের বৈঠকখানায় এসে বসতেন, যার আঘাতে বন্য মহিষও বধ করা যায়!

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন তাঁর সম্পর্কে-মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। হিন্দী কাগজপত্র অনুবাদ করবার জন্যে তাঁর একজন লোকের দরকার হয়েছিল। ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র সেই কাজটি পেলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। তখনো তাঁর পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করবারও সময় আসে নি। চির-গরিব বাপ, ছেলেকেও দেখে গেলেন দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত পরাশ্রিত অবস্থায়। অথচ এমন ছেলের জন্মদাতা তিনি!

এইসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। তাঁর চেয়ে বয়সে-ছোট সম্পর্কে-মামা, অথচ বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর সখ হয়েছিল তাঁরা একটি হার্মোনিয়ম কিনবেন! অথচ সকলেরই ট্যাক গড়ের মাঠ! অতএব সকলে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। বক্তব্যটা এই: তুমি আমাদের একটা গল্প লিখে দাও, আমরা সেটা কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাব। পুরস্কার পেলে আমাদের হার্মোনিয়ম কেনবার একটা উপায় হয়! দেখা যাচ্ছে, তখনই ওঁদের মনে ধারণা ছিল যে, শরৎচন্দ্র গল্প লিখলে সেটি পুরস্কৃত হবেই।

শরৎচন্দ্রের তখন নাম হয় নি। এবং তিনিও তখন নিজের লেখাকে প্রকাশযোগ্য ব'লে বিবেচনা করেন না। তবু নিজের নামে প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। তাই সকলের সুদৃঢ় অনুরোধে সেইদিনই তাড়াতাড়ি "মন্দির" নামে একটি গল্প লিখতে বাধ্য হ'লেন বটে, কিন্তু লেখক-রূপে নাম রইল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গল্পটি প্রতিযোগিতায় হ'ল প্রথম এবং এই হ'ল আত্মীয়-সভার বাইরে শরৎপ্রতিভার প্রথম সফল পরীক্ষা ও প্রথম গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ! কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে ঐ "মন্দির"ই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শেষ-রচনা!

শুনেছি, ভবানীপুরেও আত্মীয়-আলয়ে শরৎচন্দ্র নিজের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ ব'লে মনে করতে পারেন নি—প্রায়ই প্রাণে তাঁর আঘাত লাগত। শেষটা নিতান্ত মনের দুঃখেই তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন একেবারে

অজানা দেশ রেঙ্গুনে। এত দেশ থাকতে ঐ সুদূর প্রবাসে গেলেন যে তিনি কোন্ ভরসায়, সেটা প্রথম দৃষ্টিতে রহস্যময় ব'লেই মনে হয়। তবে শুনেছি, তাঁর আত্মীয়-সম্পর্কীয় ও রেঙ্গুন-প্রবাসী স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তাঁর পথ থেকে এ বান্ধবটিকেও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্র কোন আত্মীয়হীন দেশে গিয়ে নূতন ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল না, সেটা বলা বাহুল্য। তার উপরে তাঁর ভিতরে ছিল শিল্পীর ভাবপ্রবণতা। সাধারণ লোকের মত আত্মীয়-বন্ধুদের অবহেলা অনায়াসে সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। আগে তাঁব মত অনেক বেকার দরিদ্রই যেতেন ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও যখন সেই পথ অবলম্বন ক'রে রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হন, তাঁর সম্বল ছিল নাকি মাত্র দুই টাকা! এবং ঐ দুই টাকা ফুরিয়ে যেতেও দেরি লাগে নি। তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালীরা কিছুদিন শরৎচন্দ্রের অভাব মেটালেন—কারণ লোকের স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন তিনি খুব সহজেই। তারপর সওদাগরি আপিসে তাঁর সামান্য মাহিনার একটি চাকরি জুটল। তাঁর তখনকার অসহায় অবস্থার পক্ষে সেই কাজটিই বোধকরি যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হয়েছিল!

কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটি একাউন্টেট-জেনারেলের আফিসে একটি কাজ পেলেন। এখানে চাকরি ছাড়বার আগে তাঁর মাহিনা একশো টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল।

এই রেঙ্গুন-প্রবাসের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের বৈরাগ্য বোধহয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তাঁর সংসারী হবার সাধ হ'ল এবং তাঁর সে সাধ পূর্ণ করলেন শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী। কিন্তু এর আগেই তিনি একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ ক'রে নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুর্দ্দান্ত প্লেগ এসে তাঁদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!

আমাদের এক নিকট-আত্মীয় রেঙ্গুনে ডাক্তারী করেন; তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই মুখে শুনেছি, রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালী-সমাজে শরৎচন্দ্র খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। গানে-গল্পে তিনি সকলকেই মোহিত করতেন। সেখানে গান, গল্প, বই-পড়া, ছবি-আঁকা আর চাকরি ছাড়া তাঁর জীবনের যে আর কোন উচ্চ লক্ষ্য আছে, বাহির থেকে দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারত না। শরৎচন্দ্রের এই আর একটা বিশেষত্ব ছিল; মনে মনে নিজেকে তিনি যত আলাদা ক'রেই রাখুন, বাহিরে আর-দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারতেন। এ বিশেষত্ব বঙ্কিম-চন্দ্রের ছিল না, সাধারণ মানুষ তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করত; রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার অধুনালুপ্ত "বাঁশরী" পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম "ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র"। ঐ লেখাটিতে

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গল্পের সঙ্গেই শিল্পী বা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই ব'লে কেবল গল্পের খাতিরে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে তাদের আর টেনে আনা হ'ল না।

তবে শরৎচন্দ্রের জীবনী-কথা হিসাবে, ব্রহ্মদেশের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যদিও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সাধ্যমত আত্ম-গোপন ক'রে চলতেন, তবু অবশেষে রসিক লোকরা তাঁকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন। তার ফলে "বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে"র সভ্যদের প্রবল অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আবার "অস্ত্র ধরতে" হয়! তিনি "নারীর ইতিহাস" নামে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রকাশ্য সভায় লেখাটি তাঁর পড়বার কথা ছিল এবং সভার মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই 'কাপুরুষ' —মসী-বীর হ'লেই যে বাক্যবীর হওয়া যায় না তারই মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত! অতএব প্রবন্ধটি সভার জন্যে বাসায় রেখে, লেখক পড়লেন কোথায় স'রে! যা-হোক্ প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের নামে ধন্য-ধন্য রব প'ড়ে যায়!

শরৎচন্দ্র বরাবরই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন ব'লে তাঁর রেঙ্গুনের বাসাতেও ছোটখাটো একটি মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ বাসায় আগুন লেগে সেই সযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সঙ্গে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রশংসিত নমুনা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালীরা আনন্দে মেতে উঠতেন,—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও

তার দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব! কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের সম্বর্দ্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুনে তাঁকে নাকি 'রেঙ্গুন-রত্ন" ব'লে সম্বোধন করেছিলেন!

রেঙ্গুন-প্রবাসের মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে এই: ওখানে গিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাতবাস করতে, কিন্তু ওখান থেকেই হ'ল তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ! সে কথা বলবার আগে আর একটি দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরৎচন্দ্রের "বামের সুমতি", "পথনির্দ্দেশ", "বিন্দুর ছেলে", "নারীর মূল্য", "চরিত্রহীন" প্রভৃতি আরো অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ম ঐ রেঙ্গুনেই। সেজন্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনে রেঙ্গুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং রেঙ্গুন আশ্রয় না দিলে বাংলার শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবন কোন্ পথে ছুটত, সেটাও মনে রাখবার কথা।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, কলকাতায় তাঁর অজ্ঞাতে তখন এক কাণ্ড হ'ল। শ্রীমতী সরলা দেবী তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থেকে তার নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্রমোহন জানতেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার সময়ে তাঁর রচনাগুলি রেখে গেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেনবাবুর কাছ থেকে ছোট উপন্যাস "বড়দিদি" আনিয়ে তিন কিস্তিতে "ভারতী" পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্রের মত নেওয়া হ'ল না, কারণ তাঁদের হয়তো সন্দেহ ছিল যে, মত নিতে গেলে গল্প ছাপা হবে না! এটা ১৩১৪ সালের কথা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

"এই "বড়দিদি" সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। "বড়দিদি" যখন "ভারতী"তে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শন" চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "ভারতী"তে "বড়দিদি"র প্রথম কিস্তি পাঠ ক'রে "বঙ্গদর্শনে"র কার্য্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ বঙ্গদর্শনের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে ভারতীতে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতর-ভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তা হয়েছে, কখনো হয়ত ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ ক'রে রেখে থাক্‌বে, প্রকাশ করেচে।" শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন "কবিতা-টবিতা কি বলছেন মশায়? উপন্যাস!" কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ত' অবাক্! বললেন, "উপন্যাস কি বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখ্‌লাম্ই বা কখন্ আর ভারতীতে তা প্রকাশিত হ'লই বা কেমন ক'রে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ।" পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্ত্তমান তবু বলবেন ভুল করছ! বিরক্তি-গম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য-প্রকাশিত "ভারতী" বার ক'রে বড়দিদির পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন ক'রে শৈলেশ বাবু বললেন, "নাম না দিলেই কি এ আপনি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন? এখনো কি অস্বীকার করছেন?" শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্য বশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু'চার লাইন প'ড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে শেষ করলেন, তারপর বল্‌লেন, "লেখাটি সত্যিই ভারি চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার ব'লে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্য অন্য লোকের।" রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন "আপনার নয়?" এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকা

করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।"

"বড়দিদি" প্রথম প্রকাশের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা লেখার পাকা কারবারী, তাঁরা এই নূতন লেখকটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখে, শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সে-সব দৃষ্টি শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পারলে না। এবং শরৎচন্দ্রও জানলেন না যে, তাঁর জন্যে কোথাও কোন কৌতূহল জাগ্রৎ হয়েছে! (এখানে আর-একটি কথা বলা যেতে পারে। পরে শরৎচন্দ্রের নাম যখন দেশব্যাপী, তখন একমাত্র "পরিণীতা" ছাড়া আর কোন উপন্যাসেরই "বড়দিদি"র মতন এত-বেশী সংস্করণ হয় নি।)

তিনি তখন কেরাণী। তিনি তখন সংসারী। এমন-কি জীবন-যাত্রার দিক দিয়েও তিনি তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত! দুর্লভ সরকারি চাকরি করেন, ক্রমেই মাহিনা বাড়বার সম্ভাবনা, অনাহারের ভয় আর নেই। "গল্পরচনা অকেজোর কাজ," তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে দু-চারজন নবীন সাহিত্যযশপ্রার্থী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুর কথা ভাবেন। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের "বড়দিদি" ভালো লেগেছিল, তাঁদের চোখে শরৎচন্দ্রের আর কোন নূতন লেখা এসে পড়ল না, তাঁরা "বড়দিদি" কথাও ভুলে গেলেন। নব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব প্রতিভা যে মগের মুল্লুকে অজ্ঞাতবাস করছে, এমন সন্দেহ তখন কেউ করতে পারে নি।

# প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উত্তম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হোলোনা।

আঠার বৎসর পরে হঠাৎ একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার নিকট থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় ক'রে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন-রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্যসত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই বাংলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম ক'রে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত-ভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।"

উপরের কথাগুলি শরৎচন্দ্রের। ঐ হ'ল তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ব্যাপারটা আমরা একটু খুলেই বলতে চাই। কারণ আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে প্রায় সমস্ত ঘটনাই। এবং এখন থেকে শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্যে আমাদের আর জনশ্রুতির বা অন্য কোন লেখকের উপরে নির্ভর করতে হবে না।

"যমুনা" একখানি ছোট মাসিক কাগজ। "লক্ষ্মীবিলাস তৈলে"র সত্বাধিকারীরা প্রথমে এই কাগজখানি বের করেন। তারপর এর ভার নেন, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। সে হচ্ছে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রথমে "যমুনা"র গ্রাহক দুইশতও ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনকার উদীয়মান এবং কয়েকজন নাম-করা লেখক লেখা দিয়ে "যমুনা"কে সাহায্য করতেন। যেমন স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা, স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ পাল, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রলাল রায়, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘটক, স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী, ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে—"প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেহই

এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না।"' উপরে যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁদের অনেকেই তখন জনসাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঢের বেশী বিখ্যাত এবং তাঁদের সাহায্যে অনেক বড় বড় মাসিকপত্র চলছে।

তবু যে "যমুনা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে নিজের কাগজের প্রধান লেখক করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই বৃহৎ প্রতিভার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের অমন অতিরিক্ত আগ্রহ না থাকলে শরৎচন্দ্রকে পুনর্ব্বার সাহিত্যের নেশা অত সহজে পেয়ে বসত না বোধ হয়। একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে সংপ্রতি বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করার জন্যে "স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের দাবি সর্ব্বাগ্রগণ্য"। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রেও (২৮—৩—১৯১৬) দেখেছি, তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ফণীবাবুকে লিখেছেন: "আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কি?" শরৎচন্দ্রকে পুনর্ব্বার কলম ধরাবার জন্যে প্রমথবাবু প্রথমে কোন চেষ্টাই করেছেন ব'লে জানি না। এ-সম্পর্কে প্রমথ-বাবুর কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। আপাতত কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শরৎচন্দ্রকে আবার সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে আনবার জন্যে যাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনের বিবৃতি উদ্ধারযোগ্য:

"১৩১৯ সাল—পূজার সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আমায় বলিলেন—বড়দিদি গল্পটা আমায় পড়িতে দাও—

বেশ মনে আছে সেদিন কালীপূজা। বেলা প্রায় দুটার সময় আমার গৃহে বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও আমি—বাঁধানো ভারতী খুলিয়া আমি 'বড়দিদি' পড়িতে লাগিলাম। শরৎচন্দ্র শুইয়া সে গল্প শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া বসেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—চুপ। তার চোখ অশ্রু-সজল, স্বর বাষ্পার্দ্র। শরৎচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে বলিলেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখিয়াছি!

তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না! আমরা তাহাকে তিরস্কার করিলাম—লেখা ছাড়িয়া কি অপরাধ করিতেছ, বলো তো! শরৎচন্দ্র উদাস মনে বসিয়া রহিলেন—বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লিখবো। লেখা ছাড়া উচিত হয় নাই। লেখা ভালো—আমার নিজের বুকই কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তিনি বলিলেন,—চাকরীতে একশো টাকা মাহিনা পাই। অনেককে খরচ দিতে হয়। শরীর অসুস্থ—সে দেশে আর কিছুদিন থাকিলে যক্ষ্মারোগে পড়িবেন—এমন আশঙ্কাও জানাইলেন।

আমি বলিলাম—তিন মাসের ছুটী লইয়া আপাততঃ কলিকাতায় চলিয়া এসো। মাসে একশো টাকা উপার্জ্জন হয়—সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

শরৎচন্দ্র কহিলেন—দেখি।

তার প্রায় তিনমাস পরে। শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় আসিলেন। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—ঐ 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন।

শরৎচন্দ্র আসিলে তাকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস চরিত্রহীন লিখিতেছি। পড়িয়া ছাখো চলে কি না!

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনের' কাপি তিনি আমার হাতে

দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনো দেখা পাও নাই। খুব বড় বই হইবে।

'চরিত্রহীন' যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল।—তিনি অনিলা দেবী ছদ্ম-নামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—"রামের সুমতি।" যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্য আবার গল্প দিলেন—পথনির্দ্দেশ।"

শরৎচন্দ্র এই সময়ে "যমুনা"-সম্পাদককে রেঙ্গুন থেকে যে-সব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি পড়লেই বেশ বুঝা যায় যে, পাথর-চাপা উৎসের মুখ থেকে কেউ পাথর সরিয়ে দিলে উৎস যেমন কিছুতেই আর নিজের উচ্ছ্বসিত গতি সংবরণ করতে পারে না, শরৎচন্দ্রের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেইরকম। অনেক-দিন-চেপে-রাখা সাহিত্যের উন্মাদনা আবার নূতন মুক্তির পথ পেয়ে শরৎচন্দ্রকেও এমনি মাতিয়ে তুলেছিল যে, "যমুনা"র ভালো-মন্দের জন্যে যেন সম্পাদকের চেয়ে তাঁরই দায়িত্ব ও মাথাব্যথা বেশী! একলাই প্রত্যেক সংখ্যার সমস্তটা লিখে ভরিয়ে দিতে চান এবং একাধিকবার তা দিয়েছেনও! এমন-কি কেবল গল্প নয়, কবিতা ছাড়া বাকি প্রত্যেক বিষয় নিয়ে কলম চালাবার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ছদ্ম-নামে তিনি সমালোচনা পর্য্যন্ত লিখ্‌তে ছাড়েন নি! তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে "নারীর লেখা" ও "কাণকাটা" নামে প্রবন্ধ দু'টি; যুক্তিসঙ্গত মতামত, সতেজ ভাষা এবং হাস্য ও বিদ্রূপ-রসের জন্যে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে মনে রাখবার মত; কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীতে ও-দুটি রচনা এখনো পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

"যমুনা"য় প্রথমেই বেরুলো শরৎচন্দ্রের নূতন গল্প "রামের সুমতি"। এ গল্পটির ভিতরে ছিল জনপ্রিয়তার অপূর্ব্ব উপাদান এবং শরৎচন্দ্রের পরিপক্ক হাতের লিপিকুশলতা। তার উপরে "রামের সুমতি"র আর একটি মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, সার্ব্বজনীনতায় সে অতুলনীয়! কারণ "রামের সুমতি" কেবল বয়স্ক পাঠকের উপযোগী নয়, তাকে অনায়াসেই শিশু-সাহিত্যেরও সমুজ্জ্বল কোহিনূর ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাবের জন্যে এমন আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন ক'রে শরৎচন্দ্র নিজের আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই একটিমাত্র গল্প সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে বুঝিয়ে দিলে যে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন এক অসাধারণ প্রতিভার উদয় হ'য়েছে।

সেদিনের কথা মনে আছে। তখন "ভারতী," "প্রবাসী," "মানসী" ও "নব্যভারত" প্রভৃতি প্রধান পত্রিকায় লিখে অল্পবিস্তর নাম কিনেছি—অর্থাৎ সম্পাদকরা লেখা পেলে বাতিল করবার আগে কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করেন! কিন্তু "রামের সুমতি" প'ড়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারলুম না! একেবারে এত শক্তি নিয়ে কি ক'রে তিনি দেখা দিলেন? সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছ থেকে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলুম—কে এই শরৎ চট্টোপাধ্যায়? কোথায় থাকেন, কি করেন? অনুসন্ধানে জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ লেখক হন নি, ১৩১৪ সালে তাঁরই লেখনীজাতা 'বড়দিদি' 'ভারতী'র আসরে গিয়ে হাজিরা দিয়েছে! মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, কলম ধ'রেই কেউ পুরোদস্তুর লেখক হ'তে পারে না; "রামের সুমতি"র শরৎচন্দ্র সেই সংস্কারের মূল আল্‌গা ক'রে দিয়েছিলেন। এখন

আশ্বস্ত হয়ে বুঝলুম, শরৎচন্দ্র নূতন লেখক নন—"রামের সুমতি"র পিছনে আছে আত্মসমাহিত সাধকের বহুদিনের গভীর সাধনা! আর্টের আসর আর 'ম্যাজিকে'র আসর এক নয়—এক মিনিটে এখানে ফলন্ত আমগাছ মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে না।

১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই শরৎচন্দ্র "যমুনা" তথা বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'লেন পূর্ণ উদ্যমে। ঐ প্রথম সংখ্যাতেই বেরুলো তাঁর পুরাতন ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস "চন্দ্রনাথ," নবলিখিত ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ "নারীর মূল্য" ও সদ্যরচিত বড় গল্প "পথনির্দ্দেশ"। "নারীর মূল্যে"র নূতন-রকম নবযুগের উপযোগী জোরালো যুক্তি এবং "পথনির্দ্দেশে"র লিপিকুশলতা আবার সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। (যদিও জন-প্রিয়তার হিসাবে এ গল্পটি "রামের সুমতি"র মতন সাফল্য অর্জ্জন করে নি)। শ্রাবণ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করলে "বিন্দুর ছেলে"। এ গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার আর তুলনা নেই এবং এর পরে কথাসাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়, সে-সম্বন্ধে কারুর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

১৩২০ সালের "যমুনা"য় শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিলঃ ॥ ১ ॥ "নারীর মূল্য" সম্পর্কীয় পাঁচটি প্রবন্ধ ॥ ২ ॥ কাণকাটা (প্রতিবাদ বা সমালোচনা) ॥ ৩ ॥ গুরু-শিষ্য-সংবাদ (প্রচ্ছন্নহাস্যরসাত্মক নাট্য-চিত্র) ॥ ৪ ॥ পথনির্দ্দেশ (বড় গল্প) ॥ ৫ ॥ বিন্দুর ছেলে (বড় গল্প) ॥ ৬ ॥ পরিণীতা (বড় গল্প) ॥ ৭ ॥ চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) ও ॥ ৮ ॥ চরিত্রহীন (উপন্যাস)।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। "রামের সুমতি" বেরুবার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত) একদিন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে ঐ গল্পটি প'ড়ে শুনিয়ে এসেছেন। বিজয়বাবু প্রশংসায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। এবং তাঁর মুখে শুনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ও 'রামের সুমতি' পাঠ ক'রে অভিভূত হ'য়ে যান। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় মহাসমারোহে "ভারতবর্ষ" প্রকাশের উদ্যোগ-পর্ব্ব চলছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে "ভারতবর্ষে"র লেখক রূপে পাবার জন্যে আগ্রহবান হন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন একটি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় চলছিল এবং সেখানকার সভ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরিচিত ব্যক্তি। তিনি শরৎচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্র-লালের আগ্রহের কথা জানালেন এবং তার ফলে লাভ করলেন শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" উপন্যাসের প্রথম অংশের পাণ্ডুলিপি। সকলেই জানেন, "চরিত্রহীন" কোনকালেই রুচিবাগীশদের মানসিক খাদ্যে পরিণত হ'তে পারবে না। রুচিবাগীশ বলতে যা বোঝায় দ্বিজেন্দ্রলাল তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তার কিছু আগেই তিনি করেছিলেন "কাব্যে দুর্নীতি"র বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধঘোষণা। কাজেই তাঁর নূতন কাগজে তিনি "চরিত্রহীন" প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। "চরিত্রহীন" বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে "যমুনা"য় বেরুতে আরম্ভ করে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্যে শরৎচন্দ্র মনে যে-আঘাত পেয়েছিলেন, সেটা তখনকার অনেক

সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে প্রকাশ না ক'রে পারেন নি। কিন্তু সেজন্যে আত্মশক্তির উপরে তাঁর নিজের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি কিছুমাত্র। "যমুনা"তে যখন "চরিত্রহীন" প্রকাশিত হ'তে থাকে তখনও একশ্রেণীর লোক তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন—অটল!

১৩২০ সালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে-সময়ে "যমুনা"র আপিস উঠে এসেছে ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। শ্রীমানী মার্কেটের সামনে এখন যেখানে ডি রতন কোম্পানীর আলোক-চিত্রালয়, ঐখানে ছাদের উপরে সতরঞ্চ বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় বসত "যমুনা"র সাহিত্য-আসর। শরৎচন্দ্রকেও সেখানে দেখা যেত প্রত্যহ। ওখানকার কিছু-কিছু বিবরণ পরিশিষ্টে মৎলিখিত "শরতের ছবি"র মধ্যে পাওয়া যাবে।

এবারে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন বিজয়ী বেশে! "যমুনা"য় প্রকাশিত রচনাবলী তখন তাঁকে সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজে সুপ্রসিদ্ধ ক'রে তুলেছে এবং "যমুনা"-কার্য্যালয় থেকেই গ্রন্থাকারে তাঁর প্রথম উপন্যাস "বড়দিদি" মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিদিনই নব নব অপরিচিত ভক্ত একান্ত সুপরিচিতের মতন আসেন তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ধন্য হ'তে এবং আরো আসেন মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত প্রকাশকের দল! চারিদিক থেকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের অন্ত নেই! শরৎচন্দ্র এবারে এসে বাসা বেঁধেছিলেন মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটের এক মোড়ে। সেই বাসা তুলে দিয়ে আবার যখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর তাঁকে কেরাণীগিরি ক'রে সুদূর প্রবাসে জীবনযাপন করতে হবে না!

মানুষের পক্ষে এই সফল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি কী সমধুর!

হ'লও তাই। পর-বৎসরেই কেরাণী শরৎচন্দ্র হ'লেন পুরোপুরি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এবং তখন তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পেলেন সর্ব্বপ্রথমে "যমুনা"-আসরেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার,—এখন "রায় এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ের একমাত্র সত্বাধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, শরৎচন্দ্রের শেষ পুস্তক "ছেলেবেলার গল্প" প্রকাশেরও অধিকার পেয়েছেন ঐ সুধীরবাবুই।

ঐ সময়ে শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা কতখানি চরমে উঠেছিল, একটিমাত্র ঘটনাই তা প্রমাণিত করবে। "এম, সি, সরকার" থেকে যখন "চরিত্রহীন" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল, তখন সেই সাড়ে-তিনটাকা দামের গ্রন্থ প্রথম দিনেই সাড়ে চারশত খণ্ড বিক্রী হয়ে যায়! আর কোন বাঙালী লেখক বাংলাদেশের পাঠক-সমাজের ভিতরে প্রথম দিনেই এত মোটা প্রণামী পেয়েছেন ব'লে শুনি নি! পরে তাঁর "পথের দাবী" নাকি এর চেয়েও বেশী আদর পেয়েছিল!

# গৌরবময় সাহিত্য-জীবন

শরৎচন্দ্রের মতন বৃহৎ প্রতিভা "যমুনা"র মতন ছোট পত্রিকায় বেশীদিন বন্দী থাকবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। অবশ্য শরৎচন্দ্র যদি "যমুনা"কে ত্যাগ না করতেন, তাহ'লে "যমুনা" যে কেবল আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকত তা নয়; আকারে ও প্রচারে আজ সে হয়তো বিপুল হ'য়ে উঠতে পারত, কারণ ১৩২০ সালেই তার গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল আশাতীত। কিন্তু "যমুনা" বেশীদিন আর শরৎচন্দ্রকে ধ'রে রাখতে পারলে না। . "যমুনা"র সম্পাদক রূপে পরে শরৎচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল বটে, কিন্তু "ভারতবর্ষ" তার সবল বাহু বাড়িয়ে তখন শরৎচন্দ্রকে টেনে নিয়েছে। সম্পাদক শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পসার বেশী। তাঁর সমস্ত নূতন রচনা "ভারতবর্ষে"ই প্রকাশিত হ'তে লাগল।

"যমুনা"র সর্ব্বনাশ হ'ল বটে, তবে শরৎচন্দ্রের দিক থেকে এটা হ'ল একটা মঙ্গলময় ঘটনা। কারণ "যমুনা" ধনীর কাগজ ছিল না, শরৎচন্দ্রকে সে কোনরকম অর্থসাহায্য করতে পারত না। কিন্তু "ভারতবর্ষে"র সত্বাধিকারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশক এবং তাঁদের নিয়মিত অর্থসাহায্যের উপরেই নির্ভর ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র দাসত্ব ত্যাগ ক'রে সাহিত্য-জীবনকেই গ্রহণ করলেন একান্ত ভাবে। শরৎচন্দ্রের মতন শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়ে "ভারতবর্ষে"র সত্বাধিকারীরা যে বঙ্গসাহিত্যেরই

উপকার করলেন, এ সত্য মানতেই হবে। এবং এইখানেই স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃতিত্বের কথা মনে ওঠে। কারণ শরৎচন্দ্রকে "ভারতবর্ষে"র বড় আসরে হাজির করবার জন্যে তিনি যথেষ্ট—এমন-কি প্রাণপণ চেষ্টাই ক'রেছিলেন।

"যমুনা"য় কথাসাহিত্যের যে উৎসব আরম্ভ, "ভারতবর্ষে"র মস্ত আসরে স্থানান্তরিত হ'য়ে তার সমারোহ বেড়ে উঠল! শরৎচন্দ্র তখন বাংলাসাহিত্যের জন্যে নিজের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করলেন, তাঁর লেখনীর মসী-ধারা অকস্মাৎ যেন প্রপাতে পরিণত হ'তে চাইলে বিপুল আনন্দে! সে তো বেশীদিনের কথা নয়, আজও অধিকাংশ পাঠকের মনেই তখনকার সেই বিস্ময়কর মহোৎসবের স্মৃতি নিশ্চয়ই বিচিত্র রঙের রেখায় আঁকা আছে! মোপাসাঁর সাহিত্য-জীবনের মত শরৎচন্দ্রের নবজাগ্রত সাহিত্যজীবনও প্রধানত একযুগের মধ্যেই মাতৃভাষার ঠাকুরঘরে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছিল! প্রতি মাসে নব নব উপহার—নব নববৈচিত্র্য—নব নব বিস্ময়! পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ঐ তো এক রোগজীর্ণ, শীর্ণদেহ অতিসাধারণ ছট্‌ফটে মানুষ, যাঁর মুখে ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদেরও মত বড় বড় বুলি শোনা যায় না, বিদ্বানদের সভায় গিয়ে যিনি দুটো লাইনও গুছিয়ে বলতে পারেন না, রাজপথের জনপ্রবাহের মধ্যে যিনি কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, তাঁর মধ্যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল এই মহামানুষোচিত শক্তির প্রাবল্য, নরজীবন সম্বন্ধে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে এই উদার উচ্চধারণা, সংকীর্ণ প্রচলিতের বিরুদ্ধে এই সগর্ব্ব বিদ্রোহিতা এবং কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য!

কেবল "ভারতবর্ষ" নয়, পরে মাঝে মাঝে "বঙ্গবাণী", "নারায়ণ" ও "বিচিত্রা" প্রভৃতির আসরে গিয়েও শরৎচন্দ্র দেখা দিয়ে এসেছেন, তাঁর কোন কোন উপন্যাস একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (যেমন 'বামুনের মেয়ে'), কোন কোন উপন্যাস সমাপ্ত হয় নি, কোনখানির পাণ্ডুলিপি নষ্টও হয়ে গিয়েছে (যেমন 'মালিনী')। "ভারতবর্ষে"র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস বা গল্পগুলি লিখেছিলেন: বিরাজ-বৌ, পণ্ডিত-মশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, স্বামী, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, শ্রীকান্ত (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব্ব), দত্তা, পল্লীসমাজ, মালিনী, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, বামুনের মেয়ে, নববিধান, হরিলক্ষ্মী, মহেশ, পথের দাবী, শেষ-প্রশ্ন, বিপ্রদাস, জাগরণ (অসমাপ্ত), অনুরাধা, সতী ও পরেশ, আগামী কাল (অসমাপ্ত), শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত), এবং ভালো-মন্দ (১ম পরিচ্ছেদ)। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখেছেন। শেষের দিকে শিশু-সাহিত্যেরও প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু এ-বিভাগে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করবার আগেই তাঁকে মহাকালের অহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে। তিনি অনেক পত্র রেখে গেছেন, তারও অনেকগুলির মধ্যে শরৎ-প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ আছে এবং একত্রে প্রকাশ করলে সেগুলিও সাহিত্যের অন্তর্গত হ'তে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। "নারায়ণ" পত্রিকার জন্যে গল্প নিয়ে শরৎ-চন্দ্রের কাছে একখানি সই-করা চেক পাঠিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু

লিখেছিলেন—আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুসি-মত অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন! ·········সাধারণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রও হয়তো 'বোকার মতন কাজ করেছিলেন,—কারণ নিজের অসাধারণতার মূল্য নিরুপণ করেছিলেন তিনি মাত্র একশো টাকা!

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শরৎ-সাহিত্য নিয়ে অমরা কোন কথা বলতে চাই না, কারণ শরৎচন্দ্র পরলোকে গমন করলেও তাঁর অস্তিত্বের স্মৃতি এখনো আমাদের এত নিকটে আছে যে, সমালোচনা করতে বসলে আমরা হয়তো যথার্থ বিচার করতে পারব না; লেখনী দিয়ে হয়তো কেবল প্রশংসার উচ্ছ্বাসই নির্গত হ'তে থাকবে, কিন্তু তাকে সমালোচনা বলে না! এবং এখন উচিত কথা বলতে গেলেও অনেকের কাছে তা অন্যায়-রকম কঠোর ব'লে মনে হ'তে পারে। সুতরাং ও-বিপদের মধ্যে না-যাওয়াই সঙ্গত।

অতঃপর বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে চাই। তাঁর যে-উপন্যাস নাট্যাকারে সর্ব্ব-প্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে 'বিরাজ-বৌ'। নাট্যরূপদাতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যমঞ্চ ছিল 'ষ্টার থিয়েটার'! যশস্বী নট-নটীরাই এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে 'বিরাজ-বৌ'য়ের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয় নি।

তারপর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন "মনোমোহন

"নাট্যমন্দিরে"র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন "ভারতী"-সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র পুরাণো বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কীয় একখানি নূতন নাটক লেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে "নাচঘর"-সম্পাদক সেই সুখবর জনসাধারণেরও কাছে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। শিশির-কুমার সে-সময়ে "ভারতী"র আসরে নিয়মিত রূপে হাজিরা দিতেন। নূতন নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তিনি জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন ব'লেও স্মরণ হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের নিজেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তিনি নাটক লিখতে পারেন। এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যাঁর উপন্যাসে এত নাটকীয় ক্রিয়া, সংলাপ ও ঘটনা-সংস্থান আছে, তাঁর লেখনী নিশ্চয়ই নাট্যসাহিত্যকে নূতন ঐশ্বর্য্য দান করতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত কারুর বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হ'ল না। যদিও এখনো আমাদের বিশ্বাস আছে যে, নাটক লিখলে শরৎচন্দ্রের লেখনী বিফল হ'ত না।

শিশিরকুমার তখন "নাট্যমন্দিরে" ব'সে নূতন নাটকের অভাব অনুভব করছেন এবং থিয়েটারি নাট্যকারদের তথাকথিত রচনা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ওদিকে "ভারতী" ইতিমধ্যে আবার শ্রীমতী সরলা দেবীর হস্তগত হয়েছে। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী "ভারতী"র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা" উপন্যাসকে "ষোড়শী" নামে নাট্যাকারে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখে শিশিরকুমার তখনি শরৎচন্দ্রের আশ্রয় নিলেন। শরৎচন্দ্রের হস্তে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে "ষোড়শী" 'নাট্য-

মন্দিরে'র পাদপ্রদীপের আলোকে দেখা দিয়ে কেবল সফলই হ'ল না, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করলে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র আর-একবার উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, "এইবারে আমি মৌলিক নাটক লিখব!" কিন্তু তাঁর সে-উৎসাহও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি!

"ষোড়শী"র সাফল্য দেখে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত আরো অনেকগুলি নাটক একাধিক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে গ্রহণ ও অভিনয় করা হয়েছিল, যথা— 'পল্লীসমাজ" বা "রমা", "চন্দ্রনাথ", ' চরিত্রহীন", "অচলা" ও "বিজয়া" প্রভৃতি। অভিনয়ের দিক দিয়ে কোনখানিই ব্যর্থ হয় নি। যদিও নাটকত্বের দিক দিয়ে সবগুলি সফল হয়েছে বলা যায় না—বিশেষত "চরিত্রহীন"। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের আর কোন উপন্যাসের নাট্যরূপই "ষোড়শী"র মত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি।

বাংলার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। এ-বিভাগেও সর্ব্বাগ্রে শরৎচন্দ্রকে পরিচিত করেন শিশিরকুমার, তাঁর "আঁধারে আলো"র চিত্ররূপ দেখিয়ে। তারপর নানা চিত্র-প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সাহায্যে অনেকগুলি ছবি (সবাক বা নির্ব্বাক) তৈরি করেছেন, যথা—"চন্দ্রনাথ," "দেবদাস" (সবাক ও নির্ব্বাক), "স্বামী," "শ্রীকান্ত," "পল্লী-সমাজ," "দেনা পাওনা", "বিজয়া," "চরিত্রহীন," "দেবদাস" ও "পণ্ডিত মশাই"। এদের মধ্যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে "চরিত্রহীন" ও "শ্রীকান্ত"। অন্যগুলি অল্পবিস্তর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পেরেছে। কিন্তু সকলকার উপরে টেক্কা দিয়েছে সবাক "দেবদাস",

কি চিত্রকথা হিসাবে আর কি চিত্রশিল্প হিসাবে সে অতুলনীয়! চলচ্চিত্র-জগতে আনাড়ি পরিচালকের পাল্লায় প'ড়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দান কলঙ্কিত হয়েছে বারংবার, সাধারণ রঙ্গালয়ে তা এতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নি কখনো। তার প্রধান কারণ, সাহিত্যশিক্ষাহীন বাঙালী পরিচালকদের দৃঢ় ধারণা, গল্পলেখকদের চেয়ে তাঁরা ভালো ক'রে গল্প বলতে পারেন। এই মূর্খোচিত ধারণার কবলে প'ড়ে বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নাম বহুবার অপমানিত হয়েছে। যারা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে মানে না, সে-সব হতভাগ্যের কাছে অন্যান্য লেখকরা তো নগণ্য! কিন্তু শরৎচন্দ্রের নাম রেখেছে "দেবদাস",—যদিও চলচ্চিত্র-জগতে মনস্তত্ত্বপ্রধান কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরই মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে ব'লে বিশ্বাস করি না। শরৎচন্দ্রের আরো কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যরূপলাভের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাঁর কোন কোন মানসসন্তান ইতিমধ্যেই ছবিতে হিন্দী কথা কয়েছে, ভবিষ্যতে আরো অনেকেই কইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা য়ুরোপের ও ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে, এখানে তাদের নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করবার ঠাঁই নেই। আরো কিছুকাল জীবিত থাকলে তিনি হয়তো "নোবেল-পুরস্কার" পেয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিস্মিত চিত্ত আকর্ষণ করতে পারতেন।

এক দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ততটা দেখে নিয়েছি বোধহয়। যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্ট একটুখানি ঠাঁই জোটে নি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল ক'রে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন,

প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ী, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লী-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চ'ড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন, একদিন যাঁরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান নি, তাঁরাই এখন তাঁর কাছে ছুটে এসে বন্ধু বা আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিতে ব্যস্ত হবেন, এটা কেহই কল্পনা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু এ-সব খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কারণ এমন ব্যাপার আরো বহু প্রতিভাহীন ও বিদ্যাহীন ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই: শরৎচন্দ্রের জীবনে আলাদীনের প্রদীপের মতন কাজ করেছে বাংলা-সাহিত্য। বাংলাসাহিত্য গরিবকে দুদিনে ধনী ক'রে তুলেছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বড় বড় বাঙালী সাহিত্যিকদের দিকে তাকিয়ে কি দেখি? দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্ম্মচারী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন জমিদার। হেমচন্দ্র যতদিন ওকালতি করতেন, কবিতা লিখতেন নির্ভাবনায়; কিন্তু অন্ধত্বের জন্যে ওকালতি ছাড়বার পর তাঁকে পরের কাছে হাত পেতে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছে। এবং সাহিত্য এত-বড় প্রতিভাবান মাইকেলকে কোন সাহায্যই করে নি—হাসপাতালে গিয়ে তিনি মারা পড়েছেন একান্ত অনাথের মত। বাংলাদেশের বড় সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই কেবল সাহিত্যের জোরে দুই পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন,—ভারতীর পুরোহিত হয়েও লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে করেছেন হস্তগত।

নিজের বাড়ী, নিজের গাড়ী ও নিজের টাকার কাঁড়ির গর্ব্বে

শরৎচন্দ্র একদিনের জন্যেও একটুও পরিবর্ত্তিত হন নি, তাঁর মুখে কেউ কোনদিন দেমাকের ছায়া পর্য্যন্ত দেখে নি। সাদাসিধে পোষাকে, সরল হাসি-মাখা মুখে বিনা অভিমানে তিনি আগেকার মতই আলাপী-লোকদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'তেন, যাঁরা তাঁকে চিনত না তাঁর কথাবার্ত্তা শুনেও তারা বুঝতে পারতনা যে, তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত অমর সাহিত্যস্রষ্টা! ভাণই যাদের সর্ব্বস্ব সেই পুঁচ্‌কে লেখকরা শরৎচন্দ্রকে দেখে কত শিক্ষাই পেতে পারে!

রেঙ্গুন থেকে চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র কয়েক বৎসর শিবপুরে বাসা ভাড়া ক'রে বাস করেন। কিন্তু সহরের একটানা ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে শেষটা তিনি রূপনারায়ণের রূপের ধারায় ধোয়া পাণিত্রাসে (সাম্‌তাবেড়) নিরালা পল্লী-আবাস বানিয়ে সেইখানেই বাস করতে থাকেন। বাগানে ঘেরা দোতালা বাড়ী, লেখবার ঘরে ব'সে নটিনী নদীর নৃত্যলীলা দেখা যায়; পল্লীকথার অপূর্ব্ব কথকের পক্ষে এর চেয়ে মনোরম স্থান আর কোথায় আছে? কখনো লেখেন, কখনো পড়েন, কখনো ভাবেন; কখনো বাগানে গিয়ে ফুলের চারা আর ফলের গাছের সেবা করেন; কখনো পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে যত্নে পালিত মাছদের আদরে ডেকে খাবার খেতে দেন; কখনো গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে পল্লীবাসীদের কুশল-সংবাদ নেন এবং পীড়িতদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক'রে আসেন। এই ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে আদর্শ জীবন!

কিন্তু যাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র জনতার শ্রেণী, বহুজনধাত্রী কলিকাতা নগরীও মাঝে মাঝে বোধহয় তাঁকে প্রাণের ডাকে

ডাকত! তাই শেষ জীবনে বালীগঞ্জেও তিনি একখানি বড় বাড়ী তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর তাঁর স্নেহ সহর ও পল্লীর মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

এবং সহরেও ছিল তাঁর আবাসে সকলের অবারিত দ্বার। আগন্তুকদের ভয় দেখাবার জন্যে বড়মানুষীর দিনেও তাঁর দেউড়ীতে লাঠি-হাতে চাপদাড়ী দ্বারবান বসেনি কোনদিন। তাই শরৎচন্দ্রের প্রশস্ত বৈঠকখানার ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত দেশবিখ্যাত নেতা, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পাশে নিতান্ত সাধারণ অখ্যাত লোকদের; হোম্‌রা-চোম্‌রা মোটরবিলাসী বাবুগণের পাশে কপর্দ্দকহীন মলিনবাস দরিদ্রদের; পক্ককেশ গম্ভীরমুখ প্রাচীনবৃন্দের পাশে ইস্কুলের অজাতশত্রু চপল ছোক্‌রাদের। শরৎচন্দ্র ছিলেন সমগ্র মানবজীবনের চিত্রকর, তাই কোনরকম মানুষকেই তিনি ত্যাগ করতে পারতেন না—তিনি ছিলেন প্রত্যেকেরই বন্ধু, তাই সবাই এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুসি হয়ে বাড়ী ফিরে যেত। সেইজন্যেই আজ তাঁর মৃত্যুর পরে অগুন্তি মাসিকে, সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে স্মৃতি-কথার আর অন্ত নেই, যিনি তাঁকে একদিন দুদণ্ডের জন্যে দেখেছেন, তিনিও শরৎ-কাহিনী লিখতে ব'সে গেছেন প্রবলোৎসাহে এবং তিনিও এই ভাবটাই প্রকাশ করেছেন যে শরৎচন্দ্র তাঁকে একান্ত স্বজনেরই মতন ভালোবাসতেন! হয়তো সেইটেই আসল সত্য, বিরাট বিশ্বের বৃহৎ আকাশ থেকে ছোট্ট তৃণকণার প্রেমে যিনি হাসতে-কাঁদতে নারাজ সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া তাঁর কাজ নয়!

তাঁর গোপন দান ছিল অনেক। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অভাব ও দীনতার হাহাকারে, তাই পরের দুঃখে তিনি অটল থাকতে পারতেন না। অনেক সময়ে ভিখারীর হাতে একমুঠো সিকি দুআনী আনী ঢেলে দিয়েছেন! দেশের ডাকে হাসিমুখে যারা শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়েছে, তাদের পরিবারের অসহায়তার কথা ভেবে সমবেদনায় তাঁর প্রাণ ছটফট্ করত। তাই বহু রাজবন্দীর পরিবারে গিয়ে পৌঁছত তাঁর অযাচিত অর্থসাহায্য। শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন দেশের কাজে অগ্রণী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই কংগ্রেসের কাজে মেতে উঠতেন। শেষের দিকে শরীর ভেঙে পড়াতে এদিকে হাতে-নাতে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাঁর মন প'ড়ে থাকত জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পর্য্যন্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখবার ধারা ছিল একটু স্বতন্ত্র। বহু নবীন লেখককে জানি, যাঁরা বড় বড় লেখকের রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করেন। এটা ভুল। কারণ প্রত্যেক লেখকেরই মনের গড়ন বিভিন্ন, তাই তাঁদের রচনাপ্রণালীও হয় ব্যক্তিগত। শরৎচন্দ্র আগে 'প্লট' বা আখ্যানবস্তু স্থির করতেন না, আগে বিষয়বস্তু ও তার উপযোগী চরিত্রগুলিকে মনে মনে ভেবে রাখতেন, তারপর ঠিক করতেন তারা কি কি কাজ করবে। গতযুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

বঙ্কিম-সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র আগে মনে মনে করতেন ঘটনা-সংস্থান। শরৎচন্দ্রের আর এক নূতনত্ব ছিল। প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছি যে, মনে-মনে নূতন উপন্যাসের কল্পনা স্থির হয়ে গেলে তিনি নাকি গোড়ার দিক ছেড়ে শেষাংশের বা মধ্যাংশের দু-চারটে পরিচ্ছেদ আগে থাকতে কাগজে-কলমে লিখে রাখতে পারতেন। তাঁর "চরিত্রহীনে"র একাধিক বিখ্যাত অংশ এই ভাবে লেখা!

শরৎচন্দ্রের ঝর-ঝরে লেখা দেখলে মনে হয়, ভাষা যেন অনায়াসে তাঁর মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আসলে তিনি দ্রুত লেখকও ছিলেন না এবং খুব সহজে লিখতেও পারতেন না এবং লেখবার পরেও অনেক কাটাকুটি করতেন। বেশ ভেবে-চিন্তে বাক্যরচনা করতেন। বর্ত্তমান জীবনী-লেখক "যমুনা"র যুগে রচনায় নিযুক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন একাধিকবার। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্র যেন বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন! এবং প্রত্যেক ভালো লেখকেরই পক্ষে এইটেই হয়তো স্বাভাবিক! রচনাও তো জননীর প্রসব-বেদনার মত;—যন্ত্রণাময় অথচ আনন্দময়!

যশস্বী হয়ে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য সম্পাদকের লেখার জন্যে তাগাদা সহ্য করেছেন, অটল ভাবে এবং অম্লানবদনে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মত তাগাদার চোটে সহসা যা তা একটা কিছু লিখে দিয়ে কারুকে কখনো তিনি খুসি করতেন না। সম্পাদকরা রাগ করবেন ব'লে তিনি

সাহিত্যের অপমান করতে রাজি ছিলেন না—টাকার লোভেও নয়!

কথিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা ছিল শরৎচন্দ্রের মতবিরুদ্ধ। এ ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন কদাচ। এ-বিষয়ে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন। কথ্য ভাষার সুদৃঢ় দুর্গ 'ভারতী' আসরেও গিয়ে তিনি বহুবার নিজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

সাহিত্য-সেবার জন্যে তাঁর ভাগ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ হয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে "জগত্তারিণী পদক"। এ-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু, পুস্তকের প্রকাশক ও "মৌচাক"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার লিখছেন: "সভা-সমিতিকে তিনি বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে-বারে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে "জগত্তারিণী" মেডেল দেওয়া হয়, সেইবারের কনভোকেশনের দিনে মেডেল দিবার সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মেডেল পরিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাই সেইদিন তিনি আমাদের দোকানের নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।" আমরা জানি, সর্ব্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রকে যেদিন একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি করা হয়, সেদিনও তিনি সুধীরচন্দ্রের পুস্তকালয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এমন লুকোচুরি ক'রে ছিনেজোঁক সভাওয়ালাদের কতদিন আর ফাঁকি দেওয়া যায়? শেষের দিকে শরৎচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে সভার অত্যাচার সহ্য করতে হ'ত, কিন্তু তাঁর লাজুক ভাব কোন কালেই যায় নি। আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এইরকম সভা-ভীতি দেখেছি।

তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার ব্যাপারে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রেরও চেয়ে পশ্চাৎপদ!

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। মৃত্যুর অনতিকাল আগে এই "ডক্টর" উপাধি লাভ ক'রে হয়তো তিনি যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন—যদিও তাঁর প্রতিভার মূল্য ঐ উপাধির চেয়ে ঢের বেশী। উপাধি মানুষকেই বড় করে, প্রতিভাকে নয়।

১৩৩৯ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন-হলে "শরৎ-জয়ন্তী"র আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে একশ্রেণীর লোক এমন অশোভন কাণ্ড করেছিল, যা ভাবলে আজও লজ্জা পেতে হয়! এর আগে ও পরে জীবনে আরো বহু বৃহৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সম্মানলাভ করেছেন, কিন্তু এখানে তার ফর্দ্দ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি, কারণ ও-সব শোভা পায় সুবিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের যা বলবার তা মোটামুটি বলা হ'য়ে গেছে। তবে সাধারণ পাঠক হয়তো তাঁর আরো কোন কোন পরিচয় পেতে চাইবেন। এখানে তাই আরো কিছু বলা হ'ল। যাঁরা এর চেয়েও বেশী-কিছু চাইবেন, পরিশিষ্ট অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

জীবজন্তুর প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলে-বেলাতেও তিনি বাক্সে ক'রে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্য্যা করতেন নিজের হাতে। কোন বাড়ীর উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলা-ফেরা করতে দেখলে

তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন,—যদি সে প'ড়ে যায়! পাখী, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তাঁর পোষা দেশী কুকুর "ভেলু" তো প্রায়-অমর হয়ে উঠেছে! "যুবরাজ," "বংশীবদন" প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন! কেবল ভেলু নয়, যে-কোন পথচারী কুকুর ছিল তাঁর স্নেহের পাত্র। নিজের মোটর-চালককে বলা ছিল, পথে যদি কখনো সে কুকুর চাপা দেয়, তাহ'লেই তার চাকরি যাবে! তাঁর এই কুকুর-প্রীতি দেখলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের লাইন মনে হয়ঃ

"কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!"

ভেলুর কয়েকটি গল্প পরিশিষ্টে "শরতের ছবি"তে দেওয়া হ'ল। পাণিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাঁকে চিন্‌ত। দুটি মাছ আবার তাঁকে সব-চেয়ে বেশী ভালোবাসত। একবার বর্ষায় রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছদুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে তাঁর দুঃখ কত! তাঁর বাগানের একটি গর্তে দুটি বেজী তাদের বাচ্ছা নিয়ে বাস করত। গাঁয়ের এক ছেলে সেই বাচ্ছাটিকে চুরি ক'রে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর ক'রে বাচ্ছাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র যা তা খেলো কাগজে লিখতে পারতেন না। আর কোন লেখককেই তাঁর মতন নিয়মিত ভাবে দামী কাগজে লিখতে

দেখি নি। লেখার সরঞ্জাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই সৌখীনতা রচনার প্রতি তাঁর পবিত্র নিষ্ঠাকেই প্রকাশ করে। তাঁর হাতে বরাবরই ফাউণ্টেন পেন দেখেছি, যখন ও-'পেনে'র চলন হয় নি, তখনো। তিনি খুব বড় ও মোটা কলম ও সূক্ষ্ম নিব ব্যবহার করতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দামী ফাউণ্টেন পেন উপহার দিতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর হাতের লেখার ছাঁদ ছোট হ'লেও চমৎকার ছিল। যেন মুক্তার সারি!

তামাক ছাড়া তাঁর একদণ্ড চলত না। লেখবার সময়েও গড়গড়ায় তামাক খেতেন। কেউ তাঁকে গড়গড়া উপহার দিলে খুসি হ'তেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুও ছিলেন গড়গড়ার এমনি ভক্ত। তিনি চায়েরও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। অনেক দিনই তাঁকে আট-দশ পিয়ালা চা-পান করতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর একটি বদ-অভ্যাস ছিল—আফিম খাওয়া।

তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় ব'সে থাকতে পারতেন না। কখনো চেয়ারের উপরে দু পা তুলে ফেলতেন, কথা কইতে কইতে কখনো মাথার চুলের ভিতরে অঙ্গুলী সঞ্চালন করতেন, কখনো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একবার পায়চারি ক'রে আসতেন! সভাপতি রূপেও এ অস্থিরতা তিনি নিবারণ করতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরতেন বটে, কিন্তু কোনদিনই তিনিই ফিট্‌ফাট্ পোষাকী বাবু হ'তে পারেন নি। বেশীর ভাগ সময়েই আটপৌরে জামা-কাপড়ে একছুটে বেরিয়ে পড়তেন। একসময়ে তালতলার চটি ছাড়া আর কোন জুতো

পরতেন না। বাড়ীতে তাঁকে হাত-কাটা জামা প'রে থাকতে দেখেছি।

যৌবন-সীমা পার হবার আগেই তিনি নিজেকে বুড়ো ব'লে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। একবার হাওড়ার এক সভায় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি নিজের প্রাচীনতার গর্ব্ব প্রকাশ করেন। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত মুখে সেদিন মৃদু কৌতুকহাস্য লক্ষ্য ক'রেছিলুম! তাঁর আগেকার অধিকাংশ পত্রেই এই কল্পিত বৃদ্ধত্বের দাবি দেখা যায়।

প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবনের প্রথম কয় বৎসর এই-সব জায়গায় গিয়ে তিনি প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন: ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের "যমুনা"-কার্য্যালয়ে ও পরে "মর্ম্মবাণী"-কার্য্যালয়ে; সুকিয়া ষ্ট্রীটে "ভারতী-কার্য্যালয়ে; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে; রায় এম সি সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে; ৬৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায়, এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের আলয়ে। শেষ-জীবনে তাঁকে আর কোন সাহিত্য-বৈঠকে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে তিনি একাধিক থিয়েটারি আসরে (প্রায়ই দর্শক রূপে নয়) উপর-উপরি হাজিরা দিতেন।

পাণিত্রাসে যে-সব সাক্ষাৎপ্রার্থী গিয়ে উপস্থিত হ'তেন, তাঁরা ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্রের অতিথি-সৎকারে অভিভূত হয়ে। তিনি পরমাত্মীয়ের মত সকলকে ভালো ক'রে না খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক লেখক হ'লেও মানুষ-শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেকেলে হিন্দু-স্বভাবটাই বেশী ক'রে ফুটে উঠত।

আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই নিজেদের কোন বিশেষ দলভুক্ত ব'লে মনে করেন এবং এটা সগর্ব্বে প্রচারও করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বরাবরই ছিলেন দলাদলির বাইরে। প্রাচীন ও আধুনিক সব দলেই তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে মিশেছেন একান্ত অন্তরঙ্গের মত, কিন্তু কোথাও গিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন নি, বা কোন দলের বিশেষ মনোভাব তাঁর মনকে চাপা দিতে পারে নি। কেবল তাই নয়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি নিজেও কোন দলগঠন করেন নি। সাহিত্যক্ষেত্রে "শরৎচন্দ্রের দল" ব'লে কোন দল নেই। অথচ এমন দলসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে ছিল অত্যন্ত সহজ!

ভবিষ্যতের ইতিহাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন স্থাপন করবে কত উচ্চে, আজ তা কল্পনা করা কঠিন। তবে বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মাঝখানে যে অন্য কারুর ঠাঁই হবে না, এটা নিশ্চিত রূপেই বলা যায়। এবং শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কাহিনী যে সুদূর ভবিষ্যৎ যুগকেও বিস্মিত করবে সে-বিষয়েও সন্দেহ করবার কারণ নেই।

এখন বাকি রইল শরৎচন্দ্রের শেষ রোগশয্যার কথা। সেটা নিজে না ব'লে এখানে "বাতায়নে"র বিবরণী উদ্ধার ক'রে দিলুম :

"মৃত্যুর বছর দুই পূর্ব্বে থেকে শরৎচন্দ্রের শরীরে ব্যাধি প্রকট হয়। চিরদিন তিনি বলতেন, শরীরে আমার কোন ব্যাধি নেই, শুধু অর্শটাই মাঝে মাঝে যা একটু কষ্ট দেয়। অর্শ যে আর সারবে তা আমার মনে হয় না, তা এতদিন ও আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়) ওর পরম শত্রু। সে

বলে, ওকে তাড়াতেই হবে। এ-কথা ওকে আর জানতে দিইনে। জানলে ভয়ে ও এমনি সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে যে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত ক'রে তুলবে। একেই ত ওকে খুশী রাখতে দিনে কয়েক ঘণ্টা আমার কাটে, এর ওপর ও যদি অভিমান করে তাহলে বুঝতেই পারচ আমার অবস্থা কি হবে!...অর্শর কথা উঠলে এমনি পরিহাসই তিনি করতেন।

দিন যায়—অর্শ ব্যাধিটী পুরাতন ভৃত্যের মত তাঁর সঙ্গেই থাকে। একদিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে তাকে তাঁর দেহ থেকে কেটে বার ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, বাঁচলুম! এতদিনে সত্যিই ও আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু ভয় হয়, প্রতিশোধ নিতে ও কুমুদকে না ধরে।

হঠাৎ তাঁর শরীরে প্রতিদিন জ্বর হতে লাগল আর সঙ্গে কপাল থেকে মাথা পর্য্যন্ত এক রকম যন্ত্রণার সূত্রপাত হ'ল। জ্বরও ছাড়তে চায় না— যন্ত্রণাও যেতে চায় না। একদিন জ্বর গেল, কিন্তু যন্ত্রণা রয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, 'নিউরলজিক পেন্'।...নানা চিকিৎসা চলতে লাগল, —শেষে যন্ত্রণারও উপশম হ'ল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে পেটে একরকম অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। পরীক্ষায় বুঝা গেল পাকস্থলীতে 'ক্যানসার' হয়েছে। এ কথা তাঁর কাছে গোপন রাখা হ'ল—ইতিমধ্যে রঞ্জন রশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে চিকিৎসকেরা রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হ'লেন। এদিকে শরীর তাঁর অত্যন্ত দুর্ব্বল—অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চিকিৎসকেরা বড় মুস্কিলে পড়লেন। শেষে স্থির হ'ল বাড়ী থেকে (২৪নং অশ্বিনীকুমার দত্ত রোড) তাঁকে কোন নার্সিং হোমে রেখে, শরীরে যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই তাঁকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখে পার্ক ষ্ট্রীটের একটী য়ুরোপিয়ান নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় ১লা জানুয়ারী ১৯৩৮ তারিখে তিনি চলে আসবার জন্যে এমনি জিদ ধরে বসেন যে তাঁকে অন্য নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা ব্যতীত আর উপায় রইল না। তিনি

বলেছিলেন, আমাকে যদি এখান থেকে না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমি মাথা ঠুকে মরব। এখানকার নার্সগুলো আমাকে বড় বিরক্ত করে। (মানে, তাঁকে তামাক ও আফিম খেতে দেয় না!)

যেখানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হ'ল তার নাম হচ্চে 'পার্ক নার্সিং হোম'। কাপ্তেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরস্থ ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসের ভবনের নীচের তলায় এটী অবস্থিত। এরই ১নং ঘরে তাঁকে রাখা হ'ল।

এখানে কিছুদিন রাখবার পর বুধবার ১২ই জানুয়ারী তারিখে বেলা ২.০টার সময় অত্যন্ত গোপনে তাঁর পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। এটী ক্যানসারের উপর অস্ত্রোপচার নয়। মুখের মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার শক্তি তাঁর আর ছিল না, অথচ দেহে রক্তের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার ক'রে তাঁকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি এতটুকুও শঙ্কিত ছিলেন না। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের কোন আশাই রাখেন নি, তাই তাঁরা অস্ত্রোপচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা—অস্ত্রোপচার করতেই হবে। জোর ক'রে বললেন, আমি বলচি তোমরা কর—তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই...ভয় কিসের!—I am not a woman.

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। এর পর চার দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়ারী, ২রা মাঘ, রবিবার, বেলা ১০টার সময় নার্সিং হোমেই তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়। বেলা ১১টার সময় তাঁর নিজের মোটর-গাড়ীতে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আনা হয়। বৈকাল বেলায়, ৪টের সময়, এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ তাঁর শবদেহ কেওড়াতলার শ্মশান-তীর্থে আনীত হয়। ৫-৪৫মিঃ সময়ে তাঁর চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়।"

শরৎচন্দ্র মহাপ্রস্থান করেন রবিবার, ২রা মাঘ, ১৩৪৪; তার বয়স হয়েছিল একষট্টি বৎসর দুই মাস মাত্র

মৃত্যুর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের শেষ কথা হচ্ছে, "আমাকে দাও—আমাকে দাও—আমাকে দাও!" ·········কে তাঁকে কী দিতে এসেছিল, কিসের জন্যে তাঁর এই অন্তিম আগ্রহ? ··· ··· ··· শরৎচন্দ্রের মুখ চিরমৌন, শরৎচন্দ্রের লেখনী চির-অচল। তাঁর প্রার্থিত সেই অজ্ঞাত নিধির কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

# পরিশিষ্ট—ক

## শরতের ছবি

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যের পাঠশালার আমার হাতমক্স তখন শেষ হয়েছে বোধ হয়। "যমুনা"র সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু-না-কিছু লিখি। .......... একদিন বৈকাল-বেলায় যমুনা-অপিসে একলা ব'সে ব'সে রচনা নির্ব্বাচন করছি। এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কখুস্কো চুল, একমুখ দাড়ী-গোঁফ, পরোণে আধ-ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্ছা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে সুধলুম, "কাকে দরকার?"

—"যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।"

—"ফণীবাবু এখনো আসেন নি।"

—"আচ্ছা, তাহ'লে আমি একটু বস্‌ব কি?"

চেহারা দেখে মনে হ'ল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, "এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ঐ বেঞ্চিতে ব'সে আছেন কেন?"

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ওঁর হুকুমেই এখানে ব'সে আছি।"

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, "সে কি! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেন নি?"

অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে স্বীকার করলুম, "আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী!"

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হ'ল কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ "যমুনা"য় আমার "কেরাণী" গল্প প'ড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তারপরেও আমাদের মধ্যে একাধিকবার পত্র-ব্যবহার হয়েছিল। তাঁর দু-একখানি পত্র এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি।

*

উপর-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হ'লেও, "যমুনা"য় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দ্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর-ছয়েক আগে "ভারতী"তে তাঁর "বড়দিদি" প্রকাশিত হয়ে সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর যশের ভিত্তি পাকা ক'রে তুলেছিল, ঐ তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই—বিশেষ ক'রে "বিন্দুর ছেলে।" তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রের আপিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে "যমুনা"য় দেখা দিতে সুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ ক'রে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তাঁর "চন্দ্রনাথ" ও "নারীর মূল্য"ও তখন "যমুনা"য় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনো শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মত আর বেশী-কিছু ছিল না। রেঙ্গুনে সরকারি আপিসে নব্বই কি একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউণ্টেন্ট্সিপ্ একজামিনে পাস করতে পারেন নি ব'লে তাঁর চাকরি পাকা হয় নি। শুনেছি, বর্ম্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু বর্ম্মী ভাষায় অজ্ঞতার দরুণ ওকালতি পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কারণ সরকারি কাজে পাকা বা উকিল হ'লে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ করতেন না।

*

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ 'যমুনা'-আপিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভ ক'রে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয় নি। সে-সময়ে যমুনা-আপিসে প্রতিদিন বৈকালে বেশ একটি বড সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্প-লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কবি, গল্প-লেখক ও 'সাধনা'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক ( অধুনা চলচ্চিত্র-পরিচালক ) শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'আনন্দবাজারে'র সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রকর ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও 'ভারতবর্ষে'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আরো অনেকে, সকলের নাম মনে পড়ছে না। 'যমুনা'র কর্ণধার ফণীবাবুর কথা বলা বাহুল্য। পরে এই আসরেরই অধিকাংশ লোককে নিয়ে সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত 'ভারতী'র দল গঠিত হয়। অবশ্য 'ভারতী'র দলের আভিজাত্য এ আসরে ছিল না—এখানে ছোট-বড় সকল দলেরই সাহিত্যিক অবাধে পরস্পরের সঙ্গে

মেশবার সুযোগ পেতেন। অসাহিত্যিকেরও অভাব ছিল না। এখানে প্রতিদিন আসরে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ হ'ত, শরৎচন্দ্রও মহা উৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কাতর্কিতে পরিণত হ'ত তখনো গলার জোরে তিনিও কারুর কাছে খাটো হ'তে রাজি ছিলেন না—যদিও যুক্তির চেয়ে কণ্ঠের শক্তিতে সেখানে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়! সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সেখানে যেমন অসঙ্কোচে ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেত, তাঁর কোন রচনার মধ্যেও তা পাওয়া যাবে না। সময়ে সময়ে আমরা সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে রীতিমত কোণঠাসা ক'রে ফেলেছি, কিন্তু তিনি চটা-মেজাজের লোক হ'লেও তর্কে হেরে গিয়ে কোনদিন তাঁকে মুখভার করতে দেখি নি; পরদিন হাসিমুখে এসে আমাদেরই সমবয়সী ও সমকক্ষের মতন আবার তিনি নূতন তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদীয়মান সাহিত্যিক রূপে অক্ষয় যশের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রকে যিনি দেখেন নি, আসল শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বললেও চলে। কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রকৃতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যে বা আর্টে একটা অতুলনীয় স্থান অধিকার করলে প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো প্রাণের দায়ে না হোক, মানের দায়ে ভাব-ভঙ্গি-ভাষায় সংযত হ'তে হয়।

*

শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ ক'রে তাঁর প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যে-সব মতবাদ আছে, তাঁর মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলত না। তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, "সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনো এঁকোনা। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে না আনলেও চলবে।" আবার—"পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় দেখাবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন, এটা বড় লেখকের কাজ হয় নি।" উত্তরে

আমরা বলতুম, "কেন, আপনিও তো দুরাত্মার ছবি আঁকতে ত্রুটি করেন নি! আবার আপনিও তো কোন কোন উপন্যাসে নায়িকাকে পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বেশী শাস্তি দিয়েছেন?" কিন্তু এ প্রতিবাদ তিনি কাণে তুলতেন না। উপবীতকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না, কৌলীন্য-গর্ব্ব তাঁর যথেষ্ট ছিল। 'ভারতী'র আসরে একদিন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পৈতা নেই দেখে তিনি ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "ও কি হে চারু, তোমার পৈতে নেই!" চারুবাবু হেসে বললেন, "শরৎ, পৈতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।" শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন, "না, না, বামুন হয়ে পৈতা ফেলা অন্যায়।" রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, "ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি!" কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। "যমুনা"র পরে ঐ বাড়ীতেই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায় "মর্ম্মবাণী"র কার্য্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি ছিলুম তখন "মর্ম্মবাণী"র সহকারী সম্পাদক। "যমুনা"র আসরে আমার যে-সব সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন, এই নূতন আসরেও তাঁদের কারুরই অভাব হ'ল না, উপরন্তু নূতন গুণীর সংখ্যা বাড়ল। যেমন স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি মাঝে মাঝে নিজের নূতন রচনা শোনাতে আসতেন। এবং "মানসী"রও দলের একাধিক সাহিত্যিক এখানে এসে দেখা দিতেন। এই "মর্ম্মবাণী"র আসরে ব'সে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, "সবুজপত্রে রবিবাবুর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখছেন, তোমরা দেখে নিও, আমি এইবারে যে উপন্যাস লিখব, 'ঘরে-বাইরে'র চেয়ে ওজনে তা একতিলও কম হবে না।" প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "যে উপন্যাস এখনো লেখেন নি, তার সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র তুলনা আপনি কী ক'রে করছেন!" কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, "তোমরা দেখে নিও।" এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তাঁর সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, খুব-সম্ভব শরৎচন্দ্রের পরের উপন্যাসের নাম ছিল

"গৃহদাহ"—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোন একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নকলে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সে-কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্ব্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।

*

হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোন লোকের যে-কোন কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাঁকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। যদি তাঁকে বলা হ'ত, "শরৎ-দা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে", তাহ'লে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না ক'রেই তিনি হয়তো কোন বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চ'টে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোন কোন দুষ্ট লোক এই ভাবেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত কোন বারেই এই-সব অসৎ চক্রান্ত সফল হয় নি।

*

আমি এখানে খালি ব্যক্তিগত ভাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে ও দেখাতে চাইছি, কারণ এই সদ্যগত বৃহৎ বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে এখন ব্যক্তিগত কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসছে না, আসা স্বাভাবিকই নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি বা সাহিত্য-প্রতিভা বিশ্লেষণ করবার কোন ইচ্ছাই এখন হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করলে মন্দ হবে না। আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত ব'লে প্রচার ক'রে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার জন্যে হাস্যকর চেষ্টা করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড় বড় কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হ'য়েও শরৎচন্দ্র কোনদিন এই-সব ময়ূরপুচ্ছধারীর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ান নি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব্ব করবার অধিকার তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি

বারবার এই ভাবটাই প্রকাশ ক'রে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশী করি নি, আমার জ্ঞানও বেশী নয়, তবে আমার লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে, আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই! 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প-টল্প কাকে বলে আমি তা জানি না!...এখনকার অভিজাত সাহিত্যিকরা লোককে ধাক্কা মেরে ধাপ্পা দিয়ে চমকে দিয়ে বড় হবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত যাঁরা যথার্থই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, তাঁরা বড় হন বিনা চেষ্টায় হাওয়ার মত অগোচরে বিশ্বমানুষের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়ে। জোর ক'রে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পরের প্রাণে আশ্রয় খুঁজলে নিজের প্রাণকে আগে নিবেদন করা চাই। তুমি অভিজাত সাহিত্যিক, তুমি হ'চ্ছ সোনার পাথর-বাটির রূপান্তর! যশের কাঙাল হয়ে সাগ্রহে লেখা ছাপাবে, অথচ জনতাকে ঘৃণা করবে! অসম্ভব।

*

যমুনা-আপিসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ঐ ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না,—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় ব'লেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে! ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড় বড় ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল

কাটলেট! ভেলুর অকাল-মৃত্যুর কারণ বোধ হয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার! এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলব ব'লে মনে হয় না।

যমুনা-আপিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা দুটো-তিনটের সময়ে এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোন-কোনদিন রাত্রি দুটো-তিনটেও বেজে যেত। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চ'লে গেলে শরৎচন্দ্র সুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনী। বেশী লোকের সভায় আলোচনা ( conversazione ) ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্পগুজব করবার শক্তি ছিল তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র,—শ্রোতাদের তাঁর সুমুখে ব'সে থাকতে হ'ত মন্ত্রমুগ্ধের মত। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প ব'লেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ী ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার "যকের ধন" উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষার অভাবে তার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ী ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ীর অনতিদূরেই। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত ক'রে দিতেন এবং তাঁর জীবনের কোন গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেন নি। এই ভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরো বছর-কয়েক পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে আমার ভাগ্যেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটত না। এও ব'লে রাখি, শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো

বেড়ে উঠেছিল,—Too much familiarity brings contempt, এ প্রবাদ সব সময়ে সত্য হয় না।

*

একদিন সকাল-বেলায় মা এসে বললেন, "ওরে, তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কী মিষ্টি গলা!" কৌতূহলী হ'য়ে নীচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, শরৎচন্দ্র কখন্ এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠ্যাঙ্ দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই চমৎকার! আমাকে দেখেই তিনি মৌন হ'লেন, কিছুতেই আর গাইতে চাইলেন না! তারপর আরো কয়েকবার আমার নীচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছি, আড়ালে থেকেও শুনেছি, কিন্তু যেই আমাকে দেখা অমনি তাঁর ভীরু কণ্ঠ হ'য়েছে বোবা! অথচ তাঁর সঙ্কোচের কোনই কারণ ছিল না, তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত-সাধনা করলে তিনি নাম করতেও পারতেন রীতিমত!

*

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে (এখানকার কথা "পরিশিষ্ট খ"য়ে দ্রষ্টব্য) বাস করতেন, তখন প্রতিদিন আর তাঁর দেখা পেতুম না বটে, কিন্তু আমাদের অন্যান্য আসরে তাঁর আবির্ভাব হ'ত প্রায়ই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত গল্প বলতে গেলে এখানে কিছুতেই ধরবে না, অতএব সে চেষ্টা আর করলুম না। তিনি পাণিত্রাসে যাবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত ন-মাসে ছ-মাসে, কিন্তু যখনই দেখা হ'ত বুঝতে পারতুম যে, আমার কাছে তিনি সেই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সের যুবক ও পুরাতন শরৎচন্দ্রই আছেন! অতঃপর তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে গল্প ব'লে এবারের কথা শেষ করব।

একদিন আমাদের এক আসরে ব'সে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টানছেন, এমন সময়ে অধুনালুপ্ত "বিদূষক" পত্রিকার সম্পাদক হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব। "বিদূষক"-সম্পাদক এই শরৎচন্দ্রকে কথায় হারাতে কারুকে দেখি নি এবং খোঁচা খেলে তিনি নিরুত্তর থাকবার ছেলেও ছিলেন না। "বিদূষক"-সম্পাদককে অপ্রস্তুত করবার কৌতুকের লোভে শরৎচন্দ্র বললেন, "এস বিদূষক শরৎচন্দ্র!" শরৎ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিলেন, "কি বলছ ভাই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র?" এই কৌতুকময় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরুত্তর হ'তে হ'ল "চরিত্রহীন" প্রণেতাকেই!

*

একদিন বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এক মণিহারীর দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কি কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, "হেমেন্দ্র, তুমি কিছু খাও!" আমি বললুম, "এই মণিহারীর দোকানে আপনি আবার আমার জন্যে কি খাবার আবিষ্কার করলেন?"—"কেন, অনেক ভালো ভালো লজঞ্জুস্ রয়েছে তো!"—"বলেন কি দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোট বটে, কিন্তু আমাকে লজঞ্জুস্-লোভী শিশু ব'লে ভ্রম করছেন কেন?" শরৎচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, "না হে না, তুমি বড় বেশী সিগারেট খাও! ও বদ-অভ্যাস ছাড়ো। হয় তামাক ধর, নয় লজঞ্জুস্ খাও!" দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয় নি।

*

শরৎচন্দ্র ভেলুকে কি-রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোন ভক্ত এক চাঙাড়ি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তাঁর পাশে ব'সে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে

করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙাড়ি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব্ব পরিণাম দেখে তাঁর মনের অবস্থা কি-রকম হ'ল, সে-কথা আমরা শুনিনি!

একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে বললেন, "নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হ'ল দেখচি!"—"কেন শরৎদা, কি হ'ল?"—"আরে ভাই, বল কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিস হয়েচে, পাড়ার লোকগুলো পাজীর পা-ঝাড়া!"—"সেকি, ভেলু কি করেছে?"—"কিছুই করে নি ভাই, কিছুই করে নি! একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয় নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে স্রুধু ইঞ্চি-চারেক মাংস খুব্‌লে তুলে নিয়েছে!"—"অ্যাঃ, বলেন কি, ইঞ্চি-চারেক মাংস?"—"হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কি! এই সামান্য অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েচে, ভেলুর মুখে 'মাজ্‌ল্‌' পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কি যে কষ্ট হবে, ভেবে দেখ দেখি!"

*

সারমেয়-অবতার ভেলুর এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছি। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরের বাড়ীতে, সেই সময়ে এক সকালে টেক্সো বাবু এলেন টেক্সোর টাকা আদায় করতে। বাইরের ঘরে টেক্সো-বাবু তাঁর তল্পীতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরাম ক'রে শুয়ে আছে,—যদিও তার অসন্তুষ্ট দৃষ্টি রয়েছে টেক্সোবাবুর দিকেই। শরৎচন্দ্র টেক্সোর টাকা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেলেন। টেক্সো-বাবুর কাজ শেষ হ'ল—তিনিও নিজের টাকার তল্পীর দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জ্জন ক'রে তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ ভেলুর একটা স্বভাব ছিল এই, তার মনিবের বাড়ীতে বাহির থেকে কেউ কোন জিনিষ এনে রাখলে

সে কোন আপত্তি করত না, কিন্তু বাড়ীর জিনিষে হাত দিলেই তার 'কুকুরত্ব' জেগে উঠত বিষম বিক্রমে! সুতরাং টেক্কোবাবুর অবস্থা যা হ'ল তা আর বলবার নয়! তিনি মহা-আতঙ্কে পিছিয়ে প'ড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে চিত্রার্পিতের মত,—কারণ একটু নড়লেই ভেলু করে গোঁ-গোঁ! দুই-তিন ঘণ্টা পরে স্নান-আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র আবার যখন সেখানে এলেন, টেক্কো-বাবু তখনো দেওয়ালের ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন! বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবে টেক্কো-বাবুর মুক্তিলাভের সৌভাগ্য হ'ল!

*

মনোমোহন থিয়েটারে চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই "আঁধারে আলো" দেখানো হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও গিয়েছি। একখানা ঢালা বিছানা পাতা 'বক্সে' শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেলুম। ছবি দেখানো শেষ হ'লে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের একপাটি তাল-তলার চটি অদৃশ্য হয়েছে! অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও চটির পাটি পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ হয়ে চটির অন্য পাটি বগলদাবা ক'রে উঠে দাঁড়লেন। আমি বললুম, "আর একপাটি চটি নিয়ে কি করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান।" শরৎচন্দ্র বললেন, "ক্ষেপেচ? চোর বেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে ব'সে সব দেখচে! আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেব!" তিনি খালি পায়েই গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। পরদিনই 'বক্সে'র তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি আবিষ্কৃত হ'ল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনো সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন আর্ট ও সাহিত্যের আসর "বিচিত্রা"র অধিবেশন হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং প্রতি অধিবেশনের পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, অমুক অমুক লোকের জুতা চুরি গিয়েছে। আমরা সকলেই চিন্তিত, কারণ "বিচিত্রা"র ঢালা আসরে জুতা খুলে বসতে হ'ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেঁড়া, পুরাণো জুতার আশ্রয় নিলেন, কেউ কেউ জুতা না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন এবং আমরা অনেকেই জুতার দিকেই মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র এই দুঃসংবাদ শুনেই খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে বগলে নিয়ে রবীন্দ্র-নাথের সামনে গিয়ে বসলেন—সেদিন আসরে লোক আর ধরে না! ইতিমধ্যে কে গিয়ে চুপিচুপি বিশ্বকবির কাছে শরৎচন্দ্রের গুপ্তকথা ফাঁস্ ক'রে দিয়েছে! রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে সুধোলেন, "শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী?" শরৎচন্দ্র মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললেন, "আজ্ঞে, বই!" রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?" শরৎচন্দ্র লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারেন না!

*

বছর-আড়াই আগেকার কথা। প্রায় বৎসরাবধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন আমি আমার নতুন বাড়ীতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ীর ঠিকানা পর্য্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিনতালার বারান্দার কোণে ব'সে রচনাকার্য্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে একতালায় পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম ধ'রে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে গিয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করতে উত্তর এল, "ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেননা, তোমরা যখন জন্মাও নি তখন আমি তোমাদের পুরাণো বাড়ীতে আসতুম, তোমাদের বাবা আমাকে দেখলে হয়তো, চিনতে পারবেন!" এ যে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—আজ কুড়ি-বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিত ভাবে আবার আমার বাড়ীতে!

বিশ্বাস হ'ল না,—তিনি আমার এ-বাড়ী চিনবেন কেমন ক'রে? কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখলুম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন সত্যসত্যই শরৎচন্দ্র—তাঁর পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজাকুমার বসু! সবিস্ময়ে বললুম, "শরৎদা, এতকাল পরে আমার বাড়ীতে আবার আপনি।" শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন, "হ্যাঁ হেমেন্দ্র! গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি!"—আমি ...। তাঁকে তিনতালার ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, "এ যে ... পরম সৌভাগ্য দাদা, এ যে বিনা মেঘে জল! কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এ যে হাসির কথা!" তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালের অবিখ্যাত শরৎচন্দ্রের মতই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি আবার বিদায়গ্রহণ করলেন।

*

শরৎচন্দ্র শেষ যেদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, আমার দুই মেয়ে শেফালিকা ও মুকুলিকার কাছে ব'লে গিয়েছিলেন, "শোনো বাছা, এ-সব সিগারেট ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো, তাহ'লে আবার তোমাদের বাড়ীতে আমি আসব!" তার কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে "চরিত্রহীনে"র প্রথম অভিনয়-রাত্রে আমার মেয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল, "কৈ, আপনি তো আর এলেন না?" শরৎচন্দ্র বললেন, "আমার জন্যে গড়গড়া আছে?"—"হ্যাঁ!" শুনে তিনি সহাস্যে অঙ্গীকার করলেন, "আচ্ছা, এইবারে তবে যাব!" কিন্তু এখন আর তাঁর সে-অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি, তাঁর গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর এলেন না? হায়, স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্য কতদূর?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পার্ক নার্সিং হোম

এইখানে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়

# পরিশিষ্ট—খ

## শিবপুরে শরৎ-সাহচর্যে।

এক যুগেরও ওপর শিবপুরে শরৎদার সঙ্গে বাস করেছি—প্রায় তাঁর পাশের বাড়ীতে।

সব চেয়ে তাঁর যে বিশেষত্বটি আমার মনে মুদ্রিত হ'য়ে আছে, সেটি হ'চ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। দিনের পর দিন কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা প'ড়েছি—কোনদিন তিনি প'ড়তেন আমি শুনতুম, কোনোদিন বা আমি প'ড়তুম তিনি শুনতেন। বেশীর ভাগ, আমিই প'ড়তুম। তাঁর ওখানে রোজই নানা রকমের লোক যেত। তিনি আমাকে দোরে খিল দিয়ে এসে প'ড়তে ব'লতেন তাই। লোক তাড়াবার উপায়ও ছিল ঐ কাব্যপাঠ। লোকজন আসছে দূর থেকে দেখলেই, আমাকে ব'লতেন, "শীগগির রবিবাবুর কবিতা পড়ো।" ব'লেই তিনি শুয়ে প'ড়ে, তন্ময় হ'য়ে পাঠ শুনতেন। দর্শক এসে তাঁর তন্ময় ভাব, আর অন্য সব-কিছুর প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য দেখে, দু-একটা কথা ব'লেই চ'লে যেত। কোনো কোনো শিক্ষাভিমানী লোক, অধিকাংশই ছাত্র তাদের মধ্যে, শরৎদাকে যখন ব'লতো যে রবীন্দ্রনাথের লেখার চেয়ে তাঁর লেখা প্রাণে লাগে আরো গভীরতর ভাবে, তাঁর লেখা তারা বেশ বুঝতে পারে—রবীন্দ্রনাথের লেখা দুর্ব্বোধ্য, তখন তিনি হাসতেন। এই রকম একজন অর্ব্বাচীনকে আমার উপস্থিতিতেই তিনি ব'লেছিলেন—"কারণ রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে, আর আমি লিখি তোমাদের জন্যে ; অতএব তোমরা আমার লেখা প'ড়তে থাকো, আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে থাকি।" কতদিন আমাকে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথকে খাটো ক'রে, আমাকে খুসী ক'রতে চায় যারা, তাদের আক্কেল দেওয়া যায় কি ক'রে বলতো ?"

শিবপুর থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে আর রবীন্দ্রনাথ ক'ল্‌কতায় থাক্‌লে তাঁর ওখানে, আমরা দুজনে প্রায়ই যেতুম। প্রমথবাবুর কাছে গিয়ে সত্যিই আনন্দ পেতুম—পণ্ডিত লোক, তাঁর সাহিত্য-বিতর্ক ছিল বিচিত্র ও জ্ঞানগর্ভ। রবীন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে সাধারণভাবে কথা হোতো—সেখানে গিয়ে সাহিত্য-আলোচনা কর্‌বার স্পর্দ্ধা আমাদের ছিলনা। একবার শরৎদা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বেশ একটু স্নেহ-তিরস্কার লাভ ক'রেছিলেন। সন্ধ্যের সময় জোড়াসাঁকোয় গিয়ে 'বিচিত্রা'র নীচের তলার বড়ো ঘরটায় আমরা বস্‌বার কিছুক্ষণ পরেই রবীন্দ্রনাথ নেবে এলেন। দু-একটা কথার পর তিনি ব'ললেন "শরৎ, তোমার একখানা বই প'ড়লুম—পণ্ডিতমশাই" এবং বইটি যে তাঁর ভালো লেগেছিল মোটের ওপর তাও বল্লেন। শরৎদা বিনয় ক'রে ব'ল্‌লেন "আপ্‌নি আবার ও-সব বই পড়েন কেন? ও কিছুই হয় নি। তা ছাড়া আপনার নিয়েই ত সব।" রবীন্দ্রনাথ ব'ল্‌লেন "তোমাদের এ অযথা বিনয় কেন, বল'তো। আত্মবিশ্বাস না থাক্‌লে মানুষ বড়ো হয়না, বলো, এতদিন লিখছি ভালো না হওয়াটাই আশ্চর্য্য - তা নয়, আমি ব'ললুম ভালো লেগেছে তবু তুমি ব'ল্‌লে ও কিছুই হয়নি।" তার পর তাঁর এক অনুজ-প্রতিম স্নেহাস্পদ বন্ধুর কথা উল্লেখ ক'রে বল্‌লেন "ওর ও ঐ-রকম বলা অভ্যেস - ওকে বলি তোমার কবিতা আমার ভালো লাগে, ও বলে আপনি ও-সব পড়বেন না, আপনার পড়বার যোগ্য নয়।"

শরৎদা সেই বন্ধুকে ব'লেছিলেন "কেমন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বকুনি খেয়েছ ত?" সে ব'ল্‌লে "আপনি বড়ো সাহিত্যিক তাই ও জিনিসটার আপনিই খুব বড়ো অংশ পেয়েছেন।"

অন্য বিশেষত্ব তাঁর যা লক্ষ্য ক'রেছি, তা হোলো তাঁর দরদী হৃদয়। পরিচিত হোক্‌, অপরিচিত হোক্‌, শুন্‌লেন কারুর অসুস্থতার কথা, শরৎদা চল্‌লেন দেখতে। তার দারিদ্রের জন্যে সে হ'চ্ছেনা সু-চিকিৎসিত, পাচ্ছেনা উপযুক্ত পথ্য - তার ব্যবস্থা কর্‌বার জন্যে শরৎদা হ'য়ে উঠলেন ব্যাকুল। তাঁর

অন্তরের এই ভালোবাসা কত দুঃস্থকে শান্তি দিয়েছে, তা বল্‌বার নয়। তাঁর সমস্ত লেখাতেই তাঁর এই দরদ ফুটে উঠেছে। দরদের গুণেই তাঁর প্রতি নরনারী আকৃষ্ট হোতো—তাঁর কাছে গেলে কেউ শীগগির চ'লে আসতে পার্‌তোনা, এমন চমৎকার কথাবার্ত্তা করতে পার্‌তেন তিনি।

এত বড়ো যিনি কথা-সাহিত্যিক ছিলেন, লেখার বিষয়ে তিনি কি-রকম অলস ছিলেন তা যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবেনা। জলধরদা 'ভারতবর্ষে' চ'ল্‌তি তাঁর উপন্যাসের পরবর্ত্তী অংশের পাণ্ডুলিপি আন্‌তে যেতেন শিবপুরে। অনেক উপরোধ অনুরোধ ক'রে, লেখা না দিলে তিনি জলগ্রহণ ক'র্‌বেন্ না ব'লে, অনেক তাগাদা দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ পেতেন অনেকক্ষণের পর। এর কারণ হ'চ্ছে সকল প্রতিভাশীল ব্যক্তির মতোই বাঁধাধরার গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ ক'র্‌তে তিনি ছিলেন নারাজ। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে লিখতে তাঁকে হোতোই, কিন্তু নিজের ঝোঁকে খুসী-মতো লেখা আর বিশেষ দিনে বিশেষ জায়গায় লেখা দিতেই হবে—এ দুয়ের পার্থক্য অনেক।

হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক-চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী ছিলেন—সে সব সম্বন্ধে অনেক বইও তিনি প'ড়তেন। "পারদর্শী ছিলেন" ব'ল্‌লুম এই জন্যে, অনেক জটিল রোগ তাঁকে ভালো ক'র্‌তে দেখেছি—এ্যালোপাথিক ডাক্তারের হাল-ছেড়ে দেওয়া রোগীকেও। পয়সা নিয়ে চিকিৎসা-করা আর ভালোবেসে চিকিৎসা করা এক নয় নিশ্চয়ই। নিজের জ্ঞানের সম্বন্ধে তাঁর অযথা ধারণা ছিলনা। একবার কোনো যুব লেখক তাঁকে স্বরচিত কবিতার বই উপহার দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে মতামত চায়। বই দেওয়ার সময় আমি শরৎদার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলুম না, মতামত চাইতে আসার দিন যথাসময়ে হাজির ছিলুম। শরৎদা তাকে ব'ল্‌লেন "কবিতার বই সম্বন্ধে আমার মতামত চাও কি রকম? মতামত নিও এঁদের কাছ থেকে" ব'লে চারজন কবির নাম উল্লেখ করেছিলেন। কোন পক্ষপাতিত্বের জন্যে এই নাম ক-টি তিনি করেন নি, হঠাৎ যেগুলি মুখে এলো সেগুলিই বলেছিলেন। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর

মতামত দেওয়া উচিত নয়. তিনি বড়ো ছিলেন ব'লেই একথা বল্‌তে পেরেছিলেন।

তখন তিনি চা খেতেন খুব—অন্ন খাওয়া-দাওয়া তাঁর বরাবরই কম ছিল, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মও ছিল তাঁর খুব। ইদানীং তিনি চা খেতেন না বল্‌লেই হয়। অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত তিনি জেগে থাক্‌তেন, ভোরবেলা পর্য্যন্ত এক একদিন। কারণ দুবেলা নাওয়া-খাওয়ার সময় ছাড়া আমি অষ্ট-প্রহরই তো তাঁর কাছে থাক্‌তুম, সব জানি। রাত্তিরে আমি খেয়ে দেয়ে তাঁর ওখানে যেতুম এগারটা নাগাদ। তার পর আরম্ভ হোতো রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ, রাত তিনটে চারটে পর্য্যন্ত পড়া চ'ল্‌তো। অনেকদিন দেখেছি তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে, খোলা বই বুকে রেখেই ঘুমিয়ে প'ড়েছেন।

সকালে উঠেই তাঁর কাজ ছিল ভেলিকে নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসা—বেরোবার পথে আমাকে ডেকে নিতেন, ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়ীতেই তিনি চা খাওয়াতেন। তিনি সকলের কি-রকম প্রিয় ও শ্রদ্ধার আধার ছিলেন, তা তাঁর সঙ্গে পথে বেরোলেই বুঝতে পারা যেত। ভারি মজার কথা ব'ল্‌তে পারতেন তিনি—আর তা বেশ গম্ভীর ভাবেই ব'ল্‌তেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা শরৎদা বাড়ীতে ছিলেন না, বৌদির সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ ফিরে এসে একজনদের নাম ক'রে শরৎদা ব'ল্‌লেন "ওদের বাড়ীতে যে বড়ো বিপদ!" আমরা বিস্মিত হ'যে কি বিপদ জিজ্ঞেস ক'রতে শরৎদা ব'ল্‌লেন "ওদের মেয়ের বর এসেছে কিন্তু সে এত মোটা যে দরজা দিয়ে ঢুকছে না, পোর্ট-কমিশনারদের অফিস থেকে 'ক্রেন্‌' আনতে লোক গেছে।" আমরা ত হেসেই খুন।

হাওড়া টাউন্‌হলে অনুষ্ঠিত শিবপুর ইন্‌স্‌টিটিউটের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নেতৃত্ব কর্‌বার জন্যে নিয়ে যাই। সকলে ব'লেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কক্ষনো যাবেন না। কিন্তু—যাক্‌ সে কথা,

রবীন্দ্রনাথ গেছ্‌লেন এবং নেতৃত্ব-ও ক'রেছিলেন। সহস্রাধিক লোক পরিবেষ্টিত সেই সভায়ও শরৎদা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্নেহ-তিরস্কৃত হয়েছিলেন। শরৎদা যে প্রবন্ধ সভায় প'ড়েছিলেন তার এক জায়গায় ছিল "আমি প্রাচীন হইয়াছি"। রবীন্দ্রনাথ বলেন "শরৎ, এখানে জলধরবাবু উপস্থিত আছেন, আমি আছি, তুমি কিনা বলো যে তুমি প্রাচীন হ'য়েছ!"

শরৎদার এই কথা বলা একটা অভ্যাসের মধ্যে ছিল বরাবরই—এটাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-প্রবণতার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। এই কৌতুক করবার ঝোঁক থেকে তিনি কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকায় "শ্রীমান জলধর" ব'লে জলধরদার উল্লেখ ক'রেছিলেন। জেরায় তিনি বলেছিলেন ওটা তাঁর ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে ব'লেছেন।

কবি-বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাড়ীতে শরৎদার সঙ্গে গেছি। ওঁদের দুজনের খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। বেতার-প্রতিষ্ঠানে শরৎদার শেষ জন্মদিনোৎসবে হেমেন্দ্রকুমার তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘজীবন কামনা ক'রেছিলেন। শরৎদার আর হেমেন্দ্রকুমারের যখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন আমার সঙ্গে ওঁদের কারুরই পরিচয় হয় নি।

খুব অধ্যয়নশীল ছিলেন শরৎদা—বই কিন্‌তেনও তিনি অনেক। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থরাজী তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল আর কাব্যের প্রতি, যদিও নিজে ছিলেন তিনি কথা-শিল্পী-তিলক। রোজ তাঁকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বই প'ড়তে দেখেছি শিবপুরে,—এক সময়ে। তাঁর দিদি অনিলা দেবী—যাঁর নাম তিনি প্রথমে নিজের রচনায় ব্যবহার ক'রেছিলেন—আমাদের খুব স্নেহ ক'রতেন, শরৎদার অপার শ্রদ্ধা ছিল তাঁর উপর, আমার ছিল ও আছে। শরৎদার লোকান্তরের পর কাঁদতে কাঁদতে যখন তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন "গিরিজা, দাদাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লেনা ভাই?" তখন আমিও চোখের জল সাম্‌লাতে পারিনি। মুখুজ্জে-মশায়কেও শরৎদা খুব ভক্তি ক'র্‌তেন, তিনি হ'লেন দিদির পরলোক-

গত স্বামী। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এবং ওঁদের প্রতি আকর্ষণের ফলেই শরৎদার সাম্‌তাবেড়ের বাড়ী নির্ম্মিত হ'য়েছিল।

শরৎদার কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপি শিবপুর থেকে আমার দ্বারা 'ভারতবর্ষ'-কার্য্যালয়ে প্রেরিত হ'য়েছে, এর জন্যে গর্ব্ব অনুভব ক'রছি। আমাকে তিনি সখার মতো দেখ্‌তেন, প্রায় সব জায়গায় আমাকে তিনি সঙ্গী ক'রে নিয়ে যেতেন, এ গৌরবও আমার মনে চিরদিন সঞ্চিত থাক্‌বে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক—তাঁর বাড়ীতে শরৎদা প্রায়ই যেতেন, আমাকেও নিয়ে যেতেন। সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে সাহিত্য, স্ত্রীশিক্ষা এই সব নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে, সুরেনবাবু রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আমাদের একদিন আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে শরৎদা কলেজের ছাত্রোৎসবে নেতৃত্ব ক'রেছেন, আমাকেও বক্তৃতা করিয়েছেন।

চিঠিপত্র লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল না—তাঁর কাছ থেকে পত্রোত্তর না পেয়ে বহু লোক ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন, তাঁকে অহঙ্কারী ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। কিন্তু আমাকে একবার যা লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর অন্তরটা বোঝা যাবে:—"অবশ্য এ অভিমান ক'র্‌তে পারেন যে আপ্‌নি তো কই চিঠির জবাব দেন না। এ যে আমার জীবনের কত বড অপরাধ ও লজ্জা সে আমিই জানি। কিন্তু এ মন্দ স্বভাব যাবার দিনে বদ্‌লেই বা কি হবে? যা অন্যায় হবার সে তো হ'য়েই গেছে"।

মানুষকে তিনি কতো ভালোবাস্‌তেন—যাদের দুর্গতি হ'য়েছে তাদের মহৎ কর্‌বার মতো কী দরদী প্রাণ ছিল তাঁর। নিজের শক্তিতে, নিজের গুণে, নিজের অধ্যবসায়ে তিনি বড়ো হ'য়েছিলেন। সাহায্য তিনি কারুর কাছ থেকে পান নি, বরং বাধাই পেয়েছেন। কিন্তু বাণীর স্নেহাশিসে সঞ্জীবিত তাঁর শক্তিময়ী লেখনী সব বাধাকে অতিক্রম ক'রে জয়ী হ'য়েছিল। হেমেন্দ্রকুমারের কথা অনুসারেই বলি, সাহিত্যিক জীবনের মাঝেই যে তিনি চ'লে গেলেন, তাঁর পক্ষে ভালোই হোলো—যদিও আমাদের দিক থেকে তাঁর

মৃত্যু মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা। তাঁকে যাঁরা জানতেন না, চিনতেন না, তাঁরা বুঝতে পারবেন না আমাদের ব্যথার তীব্রতা॥

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ফোন—বড়বাজার ৩০৪৩

মূল্য প্রতি শিশি—১॥০ পাউণ্ড বোতল—৭॥০

প্রাণাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেন, এম, এস্, সি

—পরিচালিত—

# কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

---

## করণ-কিল

(CORN-KIL)

যন্ত্রণাদায়ক পায়ের ও পায়ের আঙ্গুলের কড়ার সুপরীক্ষিত ঔষধ। এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। ব্যবহার-প্রণালী খুব সহজ।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

## হিলোরা

(HILORA)

অম্ল, অম্লশূল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ার মহৌষধ। ইহা রোগ চাপা না দিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতই রোগ আরোগ্য করে। ৫০ বটিকার প্রতি শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

HILORA
Trade Mark
50 TABLETS
Specific for Acidity, Indigestion and Dyspepsia.
MODERN PHARMACEUTICAL LABORATORY
CALCUTTA.

**সমস্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ডাকে লইলে ॥৵০ ডাক খরচ লাগিবে।**

MODERN PHARMACEUTICAL LABORATORY, CALCUTTA.

**Stockist :—RIMER & CO.**

**114 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta and all branches.**

## সূচিপত্র
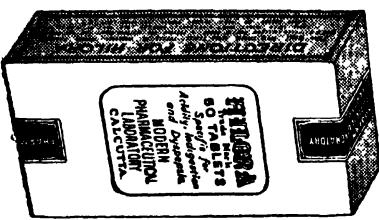

| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩৬। | নতুন বছর (কবিতা) | অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য | ৯৬ |
| ৩৭। | **ছোটদের-আসর—** | | |
| | (ক) জাঁ ক্রিস্তফ | জগন্নাথ বিশ্বাস | ৯৭ |
| | (খ) তবু শূন্য শূন্য নয়! (দৃশ্য নাট্য) | শ্রীমণীন্দ্র দত্ত | ১০০ |
| | (গ) বিষ্ণুগুপ্ত | শ্রীরবি নর্ত্তক | ১০২ |
| ৩৮। | বোশেখ-দুপুর (কবিতা) | শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী | ১০৩ |
| ৩৯। | সোনার আনারস (উপন্যাস) | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১০৪ |
| ৪০। | গরম দিনের ছড়া-ছবি | রেবতীভূষণ ঘোষ | ১০৭ |
| ৪১। | খেলা-ধূলা | এম, ডি, ডি, | ১০৮ |
| ৪২। | আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি (রাজনৈতিক) | শ্রীতারানাথ রায় | ১১০ |

## সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৪৩। সাময়িক প্রসঙ্গ— | | |
| (ক) বৃটিশ স্বর্ণগোলক | | ১১৩ |
| (খ) আগষ্ট-বিপ্লবের বীরবৃন্দ | | ১১৮ |
| (গ) বাংলার পাকচক্র | | ঐ |
| (ঘ) লড়কে লেঙ্গের নমুনা | | ১১৯ |
| (ঙ) ফিরোজ খাঁন কি চেঙ্গিস খান ? | | ঐ |
| (চ) ভুলাভাই দেশাই | | ঐ |
| (ছ) শ্রীনিবাস শাস্ত্রী | | ১২০ |
| (জ) রিক্সার ভবিষ্যৎ | | ঐ |